বিদ্রোহী ডিরোজিও

বিনয় ঘোষ

কলকাতা ৭০০ ০০৯

"Let our teaching be full of ideas. Hitherto it has been stuffed only with facts"

Anatole France

আমার শিক্ষক, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী

মহাশয়কে

বইখানি উৎসর্গ করলাম, কলেজের ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে

বিনয় ঘোষ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

অটোমেটিক জীবন ও সমাজ

প্রবন্ধ সংকলন / ১

মেহনত ও প্রতিভা

প্রবন্ধ সংকলন / ২

ভূমিকা

নবযুগের বাংলার প্রথম চিন্তাবিপ্লবকালে দু'জন বিরাট যুগপুরুষ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মাঝখানে যুবক ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন বিরাজ করছেন। এদেশের ফিরিঙ্গিসমাজে তাঁর জন্ম হলেও, বাঙালী সমাজে তিনি চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন। আধুনিক কালের নবীন বাংলার একদল তরুণ (ইয়ং বেঙ্গল) ইতিহাসে তাঁরই নামে 'ডিরোজীয়ান' বলে পরিচিত। এই কারণে ডিরোজিওর জীবনচরিত বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি অবশ্যপাঠ্য অধ্যায়।...

বিনয় ঘোষ

৩০ ফাল্গুন ১৩৬৭
"সরসিজ"
৪৭/৪ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২

প্রকাশকের নিবেদন

'বিদ্রোহী ডিরোজিও' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। প্রায় কুড়ি বছর পরে প্রকাশিত বিদ্রোহী ডিরোজিও-র 'নতুন মূল্যায়ন ও তথ্য সংযোজিত' বর্তমান সংস্করণকে বলা যেতে পারে নতুন গ্রন্থ। অধ্যায়ের শিরোনাম ও তার বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। সংযোজিত হয়েছে দুটি নতুন অধ্যায়। ডিরোজিওর উইলের তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এবং কয়েকটি কবিতাও নতুন সংযোজন। পরিশিষ্ট অংশ আমূল পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত।

গ্রন্থকারের বাসনা ছিল, এই সংস্করণের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখবেন। সেই অনুযায়ী জায়গাও রাখা হয়েছিল। বিনয় ঘোষ সাধারণত গ্রন্থের শেষ ফর্মার প্রিণ্ট অর্ডার দেবার সময় ভূমিকা, সূচীপত্রসহ প্রথম ফর্মার আনুষঙ্গিক ম্যাটার পাঠাতেন টাইপ ও মেক-আপ-এর নির্দেশ দিয়ে। কিন্তু বিদ্রোহী ডিরোজিও'র ছাপার কাজ যখন প্রায়

শেষ হয়ে এসেছে, গুরুতর পীড়িত হয়ে গ্রন্থকার হাসপাতালে ভর্তি হন, এবং সেখানেই 'ভূমিকা' লেখা হয়নি।

প্রথম সংস্করণে দুই-অনুচ্ছেদের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের এখন আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় আমরা কেবল প্রথম অনুচ্ছেদটি পুনর্মুদ্রিত করলাম। প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রও যথাযথ রাখা হলো। তবে মনে রাখতে হবে এই উৎসর্গপত্র ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের।

ডিরোজিওর উইলের পৃষ্ঠা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌজন্য প্রাপ্ত।

প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিয়ে বিনয় ঘোষ গ্রন্থপ্রকাশ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতেন না। বইটি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় খুঁটিনাটি, বানানের সংগতি, মুদ্রণের পারিপাট্য, প্রুফ সংশোধন, সুচারু মেক-আপ, কোথায় কোন টাইপ যাবে তার নির্দেশ ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গেই তিনি নিরলস যুক্ত থাকতেন। 'বিদ্রোহী ডিরোজিও'-ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রন্থের মেক-আপ তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে। এর আগে বিনয় ঘোষ-এর দুটি প্রবন্ধ সংকলন, 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' এবং 'মেহনত ও প্রতিভা' আমরা প্রকাশ করেছি। দুটি গ্রন্থই তাঁর পছন্দ হয়েছিল। 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' তাঁর জীবৎকালে প্রকাশ করতে না-পারার ক্ষোভ আমাদের থেকেই যাবে।

সূচী

There all in silence, let him sleep his sleep
No dream shall flit into that slumber deep
No wandering mortal thither once shall wend,
here nothing over him but the heavens shall weed
There never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nighty vigils keep.

ডিরোজিও রচিত 'The Poet's Grave' কবিতার অংশ

বিদ্রোহী ডিরোজিও

১. ডিরোজীয়ান

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব চিরদিন ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, জাতিবর্ণগত দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, এসব দ্বন্দ্বের যে একদিন অবসান হবে অন্তত তা কল্পনা করতে বাধা নেই। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মূল পর্যন্ত সহজে উপড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে, এবং মানুষ ও সমাজ উভয়েরই অগ্রগতি ইতিহাসের বিধান অনুযায়ী প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, ততদিন পুরুষানুক্রমে নবীন-প্রবীণের বিরোধও বর্তমান থাকবে। মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম এবং নবীন-প্রবীণের সংঘর্ষ—এই দুটি ক্ষেত্র থেকে সমাজের গতিশক্তি সঞ্চারিত হবে চিরদিন।

উনিশ শতকে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য আদর্শ-সংঘাতের ফলে সমাজে যে জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, স্বভাবতই তার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন নবীন তরুণের দল। এই তরুণদেরই তখন অনেকে বলতেন

'ইয়ং বেঙ্গল', কেউ-কেউ বলতেন 'ইয়ং ক্যালকাটা'। রামমোহনের যুগের উপান্তে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এই তরুণদলের বিকাশ হয়। এঁরা সকলে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে ইংরেজিশিক্ষা লাভ করে নবযুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে যিনি ছাত্রদের এই নবযুগমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি বাঙালী নন, একজন ফিরিঙ্গি, বয়সে প্রায় ছাত্রদেরই মতো তরুণ, নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রগোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু ডিরোজিও ছিলেন বলে তাঁদের 'ডিরোজীয়ান'ও বলা হত। 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে বাংলার যে তরুণদল ইতিহাসে সুখ্যাত ও কুখ্যাত, তাঁরা 'ডিরোজীয়ান'।

এই তরুণদের মধ্যে প্রায় সকলেই অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন, যদিও একদিকে বা একভাবে সকলের প্রতিভার সমান বিকাশ হয়নি। কিন্তু প্রতিভাও মানুষের আসল পরিচয় নয়, পোশাকী পরিচয় মাত্র। মানুষের আদত পরিচয় 'চরিত্র'। চরিত্রগুণে তরুণ ডিরোজীয়ানরা তখনকার বাঙালী-সমাজে নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয় ছিলেন। সততা নিষ্ঠা সৎসাহস দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের এমন আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছিল তাঁদের চরিত্রে যা সাধারণ চরিত্রে সর্ব-যুগেই দুর্লভ। সামাজিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ও কীর্তির দিক থেকে সকলের পক্ষে সমস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি, হতেও পারে না। কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতার জন্য প্রত্যেকের প্রতিভা ও চরিত্রবলের প্রয়োগে পার্থক্য ঘটেছে, এবং সেই পার্থক্যের জন্য তাঁদের লোকখ্যাতিরও তারতম্য ঘটেছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, হরচন্দ্র ঘোষ বা রামতনু লাহিড়ী বা অন্যেরা তা করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকচিত্তে এই তরুণদলের সকলের চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা আজও সমানভাবে স্বীকৃত। মানুষ কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল এবং মানুষ রামতনু বা হরচন্দ্রের মধ্যে তিলমাত্র প্রভেদ নেই। এমন কি যাঁরা উল্কার মতো হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়ে নিভে গিয়েছিলেন, যেমন মহেশচন্দ্র ঘোষ, কি মাধব মল্লিক, তাঁরাও এই স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন।

অথচ এই তরুণেরা কত লাঞ্ছনা অপমান ও অত্যাচারই না সহ্য করেছেন প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে। প্রতিপক্ষদের মধ্যে প্রবীণেরাই প্রধান ছিলেন, কিন্তু সকলেই যে প্রবীণ ছিলেন তা নয়। গতানুগতিকতার গোলামি করে,

চিরাভ্যস্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যাদের দিন কেটে যায়, এবং সমাজের প্রবীণদের উপদেশের উপর যাদের আস্থা অটল, সেই সাধারণ লোকও তরুণদের বিপক্ষে পক্ককেশ প্রবীণদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রতিপক্ষদলের বিপুল শক্তি—অর্থের শক্তি, অন্ধ গোঁড়ামির শক্তি, এবং সকলের উপরে একচক্ষু ঐতিহ্যের শক্তি। এই প্রচণ্ড সংহত শক্তির বিরুদ্ধে একদল তরুণের সংগ্রাম নবযুগের বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে।

যদিও এই তরুণদলের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাহলেও যেহেতু তাঁদের আদর্শগত সংগ্রামে কোনরকম পারিবারিক সমর্থন-লাভের আশা ছিল না, সেই কারণে তাঁদের অর্থবল ছিল না, লোকবল তো ছিলই না। একমাত্র সম্বল ছিল ঐ 'আদর্শ'। বাস্তব-ভিত্তিহীন নিরবয়ব আদর্শও চুপিসাড়ে সমাজে প্রবেশ করে যে কতদূর পর্যন্ত তাকে তোলপাড় করতে পারে, ইতিহাসে সেরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলা দেশের সমাজকেও সেইভাবে তোলপাড় করেছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল, এবং কেবল 'আইডিয়া' বা আদর্শের জোরে। তাঁরা অনেক ভুল করেছিলেন, সামান্য ভুল নয়, বাছা-বাছা সেরা ভুল। এক-একটি ভুল 'ওজনে' অনেক ভারী। তরুণের ধর্ম হল ভুল করা, ইতিহাসের ধর্ম হল তরুণদের সেই ভুল স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা। ভুলের ভগ্নস্তূপের উপর নির্ভুলের ইমারত গড়ে তোলা যায়, বিশেষ করে মানবসমাজের ইতিহাসে অন্যের ভুলের ভিতর থেকে দু-চারটে শুদ্ধ সত্য আত্মপ্রকাশ করে। ইয়ং বেঙ্গলের ভুলের ভিতর থেকেও এইরকম কয়েকটি শুদ্ধ সত্য পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ-জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'ভুল' আর 'মিথ্যা' এক নয়। তরুণদল ভুল করেছিলেন, কিন্তু জীবনে কখনও একদিনের জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেননি, মিথ্যা আচরণও করেননি। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সমস্ত চলার পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে কোন্ পথ যে চোরাগলি তা তাঁরা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে ধীরে-ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই ভুল পথটা ইতিহাসের কাছে ক্ষমার্হ। তাই ভুলের পরাজয়ের কোনো গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। যে-সব সত্য সমাজে ও জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, সেইসব সত্যের জয়ের মধ্যেই তাঁদের আদর্শের জয় ও সংগ্রামের জয় ঘোষিত হবে। আজও হয়নি, ভবিষ্যতে হবে।

ইয়ং বেঙ্গলের দীক্ষাগুরু ছিলেন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, বয়সে তরুণ এবং জাতিতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি। শিক্ষকের নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বিদ্যালয়ের নাম 'হিন্দুকলেজ'।

নবযুগের বাংলার সামাজিক আদর্শের ভিত্ গড়ার জন্য, ভারতীয় হলেও, একজন ফিরিঙ্গি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ফিরিঙ্গিরা আজও আমাদের কাছে ভিন্নসমাজের লোক। তাই বাংলার সমাজের সঙ্গে ভিন্নসমাজের মানুষ ডিরোজিওর এই ঐতিহাসিক সংযোগ তাঁর জীবনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

প্রবীণ-নবীনের বিরোধ আদিকাল থেকে চলে আসছে মানবসমাজে। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার সন্ধিক্ষণে এই বিরোধ তীব্র জটিল রূপ ধারণ করেছে বারংবার। সুস্থির সমাজ সচকিত হয়ে উঠেছে সেই সংঘাতে, নবচৈতন্যের কম্পন লেগেছে তার দেহমনে। এইরকম হৃদ্‌কম্পের সঞ্চার করেছিলেন ডিরোজীয়ানরা বাংলার সমাজে। লোকচৈতন্যের মূল পর্যন্ত তাঁরা সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন নির্ভয়ে। কিন্তু বহুকালের ঘুমপাড়ানিতে এদেশের মগ্নচৈতন্য মানুষ সেই ঝাঁকুনির ফলে কতখানি চৈতন্যলাভ করেছিল তা ঠিক বলা যায় না। তবে সমাজতরীর ভরাডুবির আশংকায় স্থিতস্বার্থ প্রাজ্ঞ ও প্রবীণেরা সেদিন যে ত্রাস ও সোরগোলের সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁদের কলরব শুনে মনে হয়েছিল, সমাজে এমন একদল হঠকারী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন নৈতিক উৎপাতে দেশের ঐতিহ্যবন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে এবং নীতিবোধ, ধর্মবোধ আস্থা ভক্তি ইত্যাদির অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু নবযুগের কালাপাহাড়ের দল প্রবীণদের এই ভয়াবহ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সংগ্রামে দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আজকের বিশ শতকের বহুমুখী অগ্রগামী সমাজে প্রবীণ-নবীনের নীতি-বিরোধের ফলে পুনরায় প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সতত-সচল সমাজের বুকে আজকে জেগেছে ঝঞ্ঝামদমত্ত বলাকার অস্থিরতা, অনবরুদ্ধ বেগের আবেগ। তার পথচলার মন্ত্র হয়েছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। স্থাবর-জঙ্গমের বৈপরীত্য নববিজ্ঞানের যুগে আজ দ্রুত-বিলীয়মান। শতবর্ষ আগে বাংলার সমাজে কেন, কোনো সমাজেই এই

সামগ্রিক সচলতা ছিল না। স্থিতি-গতির বৈপরীত্য তখন ছিল সাদা-কালোর মতো সুতীব্র ও সুস্পষ্ট। কুম্ভকর্ণের অচৈতন্য নিদ্রায় অভিভূত ছিল সমাজ। সামান্য মৃদু আঘাতে তার অসাড় দেহে চৈতন্যোদয় হত না। ক্রমাগত আঘাতের পর আরও জোরে আঘাত করে ডিরোজীয়ানরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বাংলার সমাজকে সটান ও স্বনির্ভর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বও বেশ তীব্র হয়েছিল সেদিন। একদিকে সংরক্ষণের সংশয়-ভয়জড়িত আর্তনাদ, অন্যদিকে ভাঙনের নিঃশংক কোলাহল, এই দু'য়ের এক বিচিত্র ঐকতান রচিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলের যুগে। ডিরোজিও ছিলেন এই ঐকতানের প্রধান উদ্‌গাতা।

নব্যবঙ্গের ফিরিঙ্গি শিক্ষাগুরু ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, বেশি হলে দু'চার বছরের বড়। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুস্পর্শে বাংলার তারুণ্যের এই দীপ্ত প্রকাশ কেমন করে সম্ভব হয়েছিল তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

একটি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১০ এপ্রিল (অথবা ১৮ এপ্রিল) ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। ধর্মতলায় মৌলালির দরগার কয়েক গজ দক্ষিণে সার্কুলার রোডের উপর একটি বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। বছরখানেক ভাগলপুরে ছাড়া তাঁর বাইশ বছর জীবনের বাকি দিনগুলি এই বাড়িতেই কেটে যায়। এই বাড়িতে তাঁর ছাত্রদের সভা-বৈঠক বসে। অবশেষে এই বাড়িতে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে (২৬ ডিসেম্বর, সোমবার) তাঁর মৃত্যু হয়, বাইশ বছর বয়সে।

বাড়ি থেকে কয়েকশত গজ দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে ডিরোজিওর সমাধি। জন্মস্থান থেকে দক্ষিণে গোরস্থান যতদূর, প্রায় ততদূর উত্তর-পশ্চিমে ডিরোজিওর জীবনের প্রধান কর্মস্থান গোলদীঘির হিন্দুকলেজ। এই এক অথবা দুই বর্গমাইল ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর জীবনের বাইশ বছর। মধ্যে ভাগলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানের ফলে তাঁর কাব্যপ্রতিভার যে প্রাথমিক উন্মেষ হয়েছিল, অল্পকাল হলেও তা স্মরণীয়।

কলকাতা শহরে পর্তুগীজ-সমাজে ডি'রোজারিও পরিবারের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল মনে হয়। ডিরোজিওর পিতা 'জে স্কট অ্যাণ্ড কোং' নামে কলকাতার এক বিখ্যাত সদাগরী হৌসে উচ্চপদস্থ চাকুরে ছিলেন। তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ছিলেন, কারণ কলকাতার গৃহসম্পত্তি তিনি নিজের অর্থেই করেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে পাননি। পর্তুগীজরা তখন এদেশের ফিরিঙ্গিসমাজে সংখ্যালঘু হলেও, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির দিক দিয়ে অনেক গণ্যমান্য ছিলেন। ডি'রোজারিও পবিবার তাঁদের অন্যতম।

ডিরোজিওর পিতা দুই বিবাহ করেছিলেন, ডিবোজিও তাঁর প্রথম স্ত্রীর সন্তান। তাঁর আরও দুটি ভাই ও দুটি বোন ছিল। বড ভাই ফ্র্যাঙ্ক নৈষ্কর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, শেষ পর্যন্ত কলকাতার ফিরিঙ্গিসমাজে অপদার্থ কুলাঙ্গাবের কুখ্যাতি কুডিয়ে বেডিয়েছেন। ছোট ভাই ক্লডিয়াস টম-ডিক-হ্যারির মতো সাধারণ গড্ডলপ্রবাহে ভেসে গেছেন, কোনো পরিচয় কোথাও রেখে যাননি। সোফিয়া নামে একটি বোন প্রথম যৌবনে সতের বছর বয়সে মারা যায়। কেবল আমেলিয়া নামে একটি বোন পিতার সংসারে ডিরোজিওর জীবনে সদাসঙ্গী ছিল। বোনটির সুমিষ্টতা ও চরিত্রের মাধুর্য ডিরোজিওর সঙ্গে তার প্রীতিবন্ধন গাঢ় করে তুলেছিল। এই ক'টি ভাইবোন ছাডা ডিরোজিওর এক মাসিমা ছিলেন, ভাগলপুরের এক ধনিক নীলকর সাহেবকে বিবাহ করে সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। মাসিমার কাছে ভাগলপুরে যাওয়া ছাডা কলকাতা শহরের বাইরে ডিরোজিওর বিশেষ গতিবিধি ছিল না। অবশ্য মাসিমাব স্নেহের চেয়ে ভাগলপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁকে আকর্ষণ কবত বেশি। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল এই পরিবেশ। 'জঙ্গিরার ফকির' কাব্যের উপাদান এখান থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন।

ডি'রোজারিও পরিবাব সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু জানা যায় না। বাংলার সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তা ছিল না। তা ছাডা তাঁদেব দাপট-দৌরাত্ম্যের যুগ তার প্রায় একশো বছর আগে—সতের শতকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডিরোজিওর কালে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পর্তুগীজদের বিশেষ কোনো সংস্রব ছিল বলে মনে হয় না। তাঁদের বৈদেশিক স্বাতন্ত্র্যও তখন প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

যাঁরা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন তাঁরা বংশানুক্রমিক সান্নিধ্যের ফলে দেশটাকে মাতৃভূমি জ্ঞান করতে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের বিশিষ্ট কোনো দান ছিল না। ভিভিয়ান ডিরোজিও প্রসঙ্গে এইজন্যই মনে হয়, এরকম একটি সাধারণ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মে এবং তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাববিরোধী প্রতিকূল পরিবেষ্টনে প্রতিপালিত হয়ে কি করে তিনি বাংলার তরুণসমাজের শিক্ষাগুরু ও জীবনাদর্শের গুরু হতে পেরেছিলেন, এবং কোথা থেকেই বা তার প্রেরণা পেয়েছিলেন? এ-প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। হঠাৎ একটি ফিরিঙ্গি পরিবার থেকে এরকম চরিত্রের অভ্যুদয় হল কেমন করে, তার কার্য-কারণ-সম্পর্ক সন্ধান করা দায় হয়ে ওঠে। তা হলেও, যেহেতু ডিরোজিও নবযুগের বাংলার সমাজে বিস্ময়-বিশেষ, তাই তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

২. ছাত্র ডিরোজিও

পরিবারের চেয়ে ডিরোজিওর জীবনে বহিরাবেষ্টনের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেক বেশি গভীর ছিল। তাঁর জীবনের আসল বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়ে, পিত্রালয়ে নয়। ছ'বছর থেকে চোদ্দবছর বয়স পর্যন্ত ডিরোজিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের নাম 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি', শিক্ষকের নাম ডেভিড ড্রামণ্ড।

ধর্মতলায় চাঁদনির কাছে ছিল ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল। তার উত্তরে ছিল গুমঘর, পশ্চিমে হসপিটাল স্ট্রীট, দক্ষিণে ধর্মতলা এবং পুবে হার্ট সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল। উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম চারিদিক থেকেই স্কুলে প্রবেশ করা যেত। মৌলালি থেকে চাঁদনির স্কুলে হেঁটে যেতে বালক ডিরোজিওর দশ-পনের মিনিটের বেশি সময় লাগবার কথা নয়।

সাহেব ও ফিরিঙ্গিদের স্কুলের মধ্যে ড্রামণ্ড, শেরবোর্ন ও হাটম্যান, এই তিনজনের স্কুলের তখন সুনাম ছিল কলকাতায়। ধর্মতলায় ছিল

ড্রামণ্ডের স্কুল, উত্তর-চিৎপুর অঞ্চলে আদিব্রাহ্মসমাজের কাছে ছিল শেরবোর্নের স্কুল, আর হাটম্যানের স্কুল ছিল বৈঠকখানায়। কলকাতার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের সন্তানেরা অনেকে এই কয়েকজন ফিরিঙ্গিগুরুর কাছে যৎকিঞ্চিৎ কালোপযোগী ইংরেজিবিদ্যা আয়ত্ত করে তদানীন্তন সমাজে অপ্রত্যাশিত বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ওয়ার্ডবুক ও স্পেলিংবুকের কতকগুলি নিত্যব্যবহার্য ইংরেজি শব্দ কোনক্রমে কণ্ঠস্থ করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আজ শত-শত ইংরেজি কেতাব পাঠ করে, বড-বড় ডিগ্রী নিয়েও আমরা কল্পনায় তার নাগাল পাই না। বাস্তবিক লেখাপডা করে গাডিঘোডা চড়া সম্ভব ছিল সেকালে, একালে নয়।

আঠার শতকেব শেষ পর্বে কলকাতা শহরে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হবার পর থেকে, অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে, ইংরেজিশিক্ষার আগ্রহ এদেশের লোকের মনে জাগতে থাকে। প্রধানত আদালতের বাঙালী মুহুরিরা এই আদিপর্বের ইংরেজি শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখনও বিদেশী মিশনারীরা এ-কাজে আদৌ অগ্রসর হননি। সুতরাং ইংরেজিশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্‌যোগীর কৃতিত্ব বাঙালীদেরই প্রাপ্য, পাদ্রিদের নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তো নয়ই। অবশ্য সেকালের ইংরেজিশিক্ষা বলতে ইংরেজি শব্দশিক্ষাই বোঝাত, প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ত করার প্রশ্নই ছিল না। কোর্টের মুহুরিদেব সেরকম বিদ্যা দান করার ক্ষমতাও ছিল না। নিছক ব্যবহারিক জীবনে সাহেবদেব সঙ্গে মিলেমিশে কিছু অর্থ রোজগারের সুবিধার জন্য যে-সব ইংরেজি শব্দ ভাব-বিনিময়ের তাগিদে জেনে রাখার প্রয়োজন হত, সেইগুলি তালিকাবদ্ধ করে কোনরকমে কণ্ঠস্থ করতে পারলেই সেকালে ইংরেজির দিগ্‌গজ পণ্ডিত হওয়া সম্ভব হত। যিনি যত বেশি ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করতে পারতেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তত বেশি শহরময় ছড়িয়ে পড়ত এবং ঐ বিদ্যাটুকুর জন্য দোর্দণ্ডপ্রতাপে তাঁরা সমাজে চলাফেরা করতেন। এঁরাই ইংরেজ আমলের আদিপর্বের এদেশীয় 'ইন্‌টিলেকচ্যুয়াল।'

এইসময় থেকে বিদেশী ইংরেজরা ও ফিরিঙ্গিরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় হিসেবে নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজিশিক্ষার ছোট-ছোট স্কুল খুলতে থাকেন কলকাতায়। শেরবোর্ন, ড্রামণ্ড ও হাটম্যানের মতো মার্টিন বাউলের স্কুল ছিল আমড়াতলায়,

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মতিলাল শীল এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শেরবোর্নের ছাত্রদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যতম। আরাতুন পিক্রুসের স্কুলও মধ্য-কলকাতায় সুপরিচিত ছিল, এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কলুটোলার কানা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন ব্যাকরণহীন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি শিক্ষার জন্য সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজিশিক্ষার এই পর্বের রেশ থাকতেই ডিরোজিওর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজস্ব থেকে শিক্ষাখাতে এক কপর্দকও ব্যয় করা আবশ্যক বোধ করত না। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে মিণ্টো একটি পত্রে এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাবনতির দিকে ডিরেক্টরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছু অর্থব্যয়ের কথাও উল্লেখ করেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির নতুন অ্যাক্টে ডিরেক্টররা ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য রাজস্বের উদ্‌বৃত্ত থেকে অন্যূন বাৎসরিক একলক্ষ টাকা ব্যয় অনুমোদন করেন। ব্যয়ের অংক দেখেই বোঝা যায়, কোম্পানি কতকটা ঢেঁকি গেলার মতো করে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কিছুটা দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছিলেন। ডিরোজিও যখন ১৮১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন, কোম্পানির অধীনে আমাদের শিক্ষার তখন এই শোচনীয় হাল ছিল।

শিক্ষার জন্য কিছু অর্থব্যয় আরম্ভ হলেও, শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি কি হওয়া উচিত তা তখনও স্থির হয়নি। আধুনিককালের পাশ্চাত্যবিদ্যা বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির প্রতি কোম্পানির কর্তারা তখন বিমুখই ছিলেন। তাই শিক্ষা বলতে প্রথমদিকে তাঁরা এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত-আরবী বিদ্যার পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮২৩-২৪ থেকে ১৮৩৫ সালে মেকলের বিখ্যাত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া পর্যন্ত প্রায় দশ-বারোবছর ধরে প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যবিদ এই দুই দলের মধ্যে মতামতের প্রবল সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৮২৩ সালে রামমোহন রায় এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে আমহার্স্ট'কে একটি দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ পত্র দেবার পর থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্‌দের মতের সংগ্রাম আরও প্রবল রূপ ধারণ করে। সংগ্রামের সূচনাকালেই ডিরোজিওর ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যায়। বিতর্কের ঝড় শেষ হবার পর ১৮৩৫ সাল

থেকে ইংরেজিশিক্ষার নীতি যখন স্থিরভাবে গৃহীত হল, তার কয়েকবছর আগে ১৮৩১ সালের শেষে ডিরোজিওর ইহজীবন শেষ হয়ে যায়। ঝড়ের খানিকটা ঝাপ্‌টা অবশ্য হিন্দুকলেজে শিক্ষকতাকালে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। তবে ডিরোজিওর নিজের শিক্ষাদর্শ তার অনেক আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল, এবং হিন্দুকলেজের মতো পাশ্চাত্য ইংরেজিশিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষকরূপে যুক্ত হয়ে সেই আদর্শকে বাস্তবে যথাসম্ভব রূপায়িত করাবও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজরা, পাদ্রি সাহেব ও ফিরিঙ্গিরা ইংরেজি-শিক্ষার যে-সব বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেগুলিকে ঠিক শিক্ষায়তন বলা যায় না। ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরিবাকরির নিতান্ত প্রয়োজনে যেটুকু ইংবেজি শিখতে হত তার বেশি এইসব বিদ্যালযে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ শিক্ষকের তার বেশি শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতাও ছিল না। শেরবোর্ন, পিক্রস, হাটম্যান, ড্রামণ্ড প্রভৃতি যে কয়েকজন সাহেব-ফিরিঙ্গির ইংরেজি স্কুলের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই যে সুপণ্ডিত বা উচ্চশিক্ষা দেবার মতো যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তাও-নয়। পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামণ্ডের মতো ব্যক্তি কলকাতা শহরে তখন সহজলভ্য ছিল না। কলকাতায় যেমন তখন পণ্ডিত ও মৌলবীদের অনেক টোল-মাদ্রাসা ছিল, তেমনি সাহেব-ফিরিঙ্গিদেরও ইংরেজিশিক্ষা দেবার পাঠশালা ছিল। কোনদিক থেকেই হিন্দুকলেজের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায় না। কয়েকটি স্কুলের বিবরণ দিলে আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ফিরিঙ্গি শেরবোর্নেব স্কুল ছিল উত্তর-কলকাতায় চিৎপুর অঞ্চলে। শোনা যায় তাঁর মা ছিলেন এদেশেব ব্রাহ্মণকন্যা। তাই বোধহয় জাতফিরিঙ্গি হলেও ব্রাহ্মণ্য প্রথানুযায়ী ছাত্রদের কাছ থেকে উৎসব-পার্বণের সময় শেরবোর্ন কড়ায়গণ্ডায় গুরুদক্ষিণা আদায় করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অনেক ধনীর সন্তান তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। দোল-দুর্গোৎসবের সময় তিনি তাই বেশ মোটা রকমের ভেট পেতেন ছাত্রদের

কাছ থেকে। শেরবোর্নের বৈষয়িক বুদ্ধিও যথেষ্ট প্রখর ছিল, তিনি নিজের নামে একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তর-কলকাতায়, বাৎসরিক ৫০০ টাকা খাজনায় কোম্পানির কাছ থেকে ৯৯ বছরের লীজ নিয়ে বাজার থেকে তিনি বেশ ভাল টাকা রোজগার করতেন।

হাটম্যান ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, 'ওল্ড মিশন চার্চের' একজন গোঁড়া সমর্থক। বিদ্যার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল বেশি, তাই এদেশী ছাত্রদের অভিভাবকরা তাঁর বৈঠকখানার স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে শংকিত হতেন। ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শী বলে হাটম্যানের খ্যাতি থাকলেও ধর্মবাতিকের জন্য তিনি বিদ্যাচর্চায় বা শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করতে পারতেন না। তাঁর সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী একবার 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে (১৬ এপ্রিল, ১৮০৫) প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীটি এই : "সেদিন সন্ধ্যাবেলা মিস্টার ও মিসেস হাটম্যান তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় রাস্তার উপর হঠাৎ একটি হাতী দেখে ঘোড়া ক্ষেপে যায়। ঘটনাটি ঘটে এসপ্লানেডে। ঘোড়া ভয় পেয়ে যাত্রীসহ গাড়ি নিয়ে ড্রেনের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে। হাটম্যান সপরিবারে ক্ষতবিক্ষত দেহে বাড়ি ফেরেন।" ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হল হাটম্যানের জন্য নয়, হাতীর জন্য। ডিরোজিওর বাল্যকালে কলকাতা শহরে এসপ্লানেডের মতো জায়গায় দু'চারটে হাতীও চলেফিরে বেড়াত। তার প্রতীকী তাৎপর্য এই যে মধ্যযুগের রক্তমাংসের গজমূর্তি নবযুগের কলকাতা শহরে তখনও অচল বা অদৃশ্য হয়নি।

সিমলাতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের পুবদিকে মেকলে নামে এক সাহেব একটি স্কুল খুলেছিলেন। সেখানে ইংরেজি বাংলা ফার্সী সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফার্সী সংস্কৃত ও লাটিনের জন্য সাহেব মাসিক চার টাকা বেতন এবং ইংরেজি ও বাংলার জন্য তিন টাকা বেতন ধার্য করেছিলেন। বয়সের কোনো বাধা ছিল না বলে তাঁর স্কুলে ছাত্রসংখ্যাও কম ছিল না।

এইধরনের ছোট বিদ্যালয় হলেও, ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির খানিকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। শেরবোর্ন বা হাটম্যানের সঙ্গে ড্রামণ্ডের দৈহিক বা মানসিক চেহারার যেমন কোনো সাদৃশ্য ছিল না, তেমনি তাঁর স্কুলটিও ছিল একেবারে অন্য রকমের। ড্রামণ্ড ছিলেন খাঁটি বিলেতি সাহেব, জাতে স্কচম্যান। যেমন দুর্ধর্ষ ও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক, তেমমি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর অনুরাগ ছিল। ডিরোজিওর জন্মের বছর চার পরে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ড্রামণ্ড সাহেব স্কটল্যাণ্ড থেকে বাংলায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করে কিছু অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু অন্য কোনো বাণিজ্যে জড়িত না হয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে তিনি 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পরে নিজে তার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন। তাঁর পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটি কুঁজ ছিল বলে শহরের লোকের কাছে তিনি 'কুঁজো স্কচম্যান' বলে পরিচিত ছিলেন। বাইরের এই দৈহিক বিকৃতির ক্ষতিপূরণস্বরূপ মনে হয় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আশ্চর্যরকম উন্নত বলিষ্ঠ মনের মালিক করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যিনি একবার লাভ করতেন তিনি সহজে তাঁকে ভুলতে পারতেন না।

ড্রামণ্ড ছিলেন একেবারে ভিন্নপ্রকৃতির লোক, স্বাধীনচেতা ও প্রগতিপন্থী। 'গুরুমশায়' বা 'শিক্ষক' বলতে আমাদের মনে একটি যে নিরীহ প্রাণীর মূর্তি ভেসে ওঠে, ড্রামণ্ডের সঙ্গে তার কোথাও কোনো মিল ছিল না। অত্যন্ত সুস্থ ও সমুন্নত মন নিয়ে তিনি সমাজে বাস করতেন। শহরের মধ্যে সুন্দর একটি বড় বাড়ি তিনি ভাড়া করে থাকতেন। বোঝা যেত, বৈরাগীর আত্মনিগ্রহ তাঁর কাম্য ছিল না, ভোগবিলাস ও জীবনের রসাস্বাদনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল যথেষ্ট। বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পানভোজন ও নাচগান করতে তিনি একটুও সামাজিক সংকোচবোধ করতেন না। এই সৎসাহস (তাৎকালিক প্রথানুযায়ী) তাঁর বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তা প্রকাশের পথে তাঁর শিক্ষকতার পেশা কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর ধারণা ছিল কতকটা এইরকম—মনের দিক থেকে মানুষমাত্রই সম্রাট। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মানবিক রুচি বিকৃত না করে,

আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিকাশের জন্য যা ইচ্ছা করার স্বাধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, যাঁদের অফুরন্ত অবসর আছে তাঁরা স্বর্গলোক কোথায় তার হদিশ করুন, কিন্তু ইহজীবনে মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় প্রভু, এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই পৃথিবীতে। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামণ্ড একথা কেবল যে বন্ধুদের বা সমদর্শীদের বলতেন তা নয়, মধ্যে-মধ্যে ছাত্রদেরও শোনাতেন, এবং ছাত্রদের কর্ণেই যে কেবল তা প্রতিধ্বনিত হত তা নয়, কিঞ্চিৎ রেশ তার মর্মেও পৌঁছত।

ধর্মতলা অ্যাকাডেমির কুঁজো স্কচম্যান শিক্ষকটির এই মানসপ্রকৃতির পরিচয় অভিভাবকদের জানা থাকলেও, তাঁর শিক্ষারীতির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাতে কেউ দ্বিধা করতেন না। এদেশী ছাত্রদের অভিভাবকরা অনেকে অবশ্য ড্রামণ্ডের কাছে ছেলে পাঠাতে ভয় করতেন। ড্রামণ্ডের কাছে শিক্ষালাভ করে ছেলেরা পাছে নাস্তিক ও অতিশয় তার্কিক হয়ে উঠে সমাজে ও সংসারে বিপর্যয় ঘটায়, এই ছিল তাঁদের ভয়। তা সত্ত্বেও ড্রামণ্ড ও তাঁর বিদ্যালয়ের সুনামের জন্য ছাত্রের অভাব হত না। এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরাও অনেকে বাল্যকালে তাঁর স্কুলে লেখাপড়া শিখেছেন।

ড্রামণ্ডের গৃহের নাচগানের মজলিসের কথা বলেছি। সেইটাই যে তাঁর গৃহের বড় আকর্ষণ ছিল তা নয়। তার চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন আলোচনার মজলিস। শোনা যায়, ড্রামণ্ড নিজে ছিলেন দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত। দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাতেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তার জন্য বাড়িতে নিয়মিত বৈঠক বসত। ড্রামণ্ডের এই দর্শনপ্রীতির কথা উল্লেখ করে স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট তাঁর লেখা ফার্সী ব্যাকরণ বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলেন: "To David Drummond Esq, who amidst the luxuries of the East never lost his relish for the metaphysics and the muse ..."

প্রাচ্যের বিলাসিতার মধ্যে ড্রামণ্ডের দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ একটুও শিথিল হয়নি। 'D. D.' নাম দিয়ে নিয়মিত সমসাময়িক ইংরেজি পত্রিকায় কবিতা ও সাহিত্যবিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে তার

খোঁজখবর বিশেষ কেউ রাখতেন না। সাহিত্যের সমঝদারগোষ্ঠী কলকাতার সমাজে তখনও গড়ে ওঠেনি। বিদ্যোৎসাহী ইংরেজদের মধ্যে অনেকে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। শোনা যায়, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' বিষয়ে তাঁর একটি কবিতা পাঠ করে মেটকাফ সাহেব অতিশয় প্রীত হয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থের জন্য পঞ্চাশ টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সাহিত্যচর্চা ছাড়াও সাংবাদিকতাক্ষেত্রে ড্রামণ্ড একজন কৃতী সম্পাদকরূপে তৎকালে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম *Weekly Examiner—A Journal of Politics, News and Literature.* প্রায় বছর দুই চলার পর (১৮৩৯-৪০) পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ৫৬ বছর বয়সে ড্রামণ্ডের মৃত্যু হয়। তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর মৃত্যুর পর প্রায় বারোবছর তিনি বেঁচেছিলেন।

ড্রামণ্ডের কোন স্মৃতিচিহ্ন কলকাতার মতো শহরে থাকার কথা নয়। কিন্তু সার্কুলার রোডের গোরস্থানে ড্রামণ্ডের সমাধি আজও দেখা যায়। ড্রামণ্ডের সমাধির স্মৃতিফলকে লেখা আছে

Beneath lie the mortal remains of
David Drummond, a Native of Scotland
and for many years *a successful teacher of youth**
in this city : he departed this life on the
28th April 1843, aged 56 years.

This Monument was erected to the Memory
of the deceased by a few of his friends and
pupils who respected his character, admired
his talents and esteemed his worth.

'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি' অথবা 'উইকলি এক্জামিনার' পত্রিকা কোনটারই অস্তিত্ব নেই আজ। তাঁর কীর্তিচিহ্ন সবই ধুলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সমাধির গায়ে খোদাই করা এমন কয়েকটি কথা আছে যা তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ

* বাঁকা হরফ লেখকের।

নিদর্শন বলা যেতে পারে। এই কথা ক'টি হল **'a successful teacher of youth'**, তরুণদের সার্থক শিক্ষক।

ড্রামণ্ডের নিজের জীবনে না হলেও তাঁর অন্যতম ছাত্র ডিরোজিওর জীবনে এ-কথার তাৎপর্য যে কত গভীর তা সহজেই অনুমান করা যায়। এদেশে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মে ডিরোজিও কোথা থেকে এমন শিক্ষা পেয়েছিলেন যার শক্তিতে বাংলার একদল তরুণকে নবযুগের জীবনদর্শনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, এ-প্রশ্ন সকলের মনে জাগবে। প্রশ্নের উত্তর হল, শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের কাছ থেকে। কবি ও দার্শনিক ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্রের মানসভূমিতে যে সাহিত্য ও দর্শনের বীজ ছড়িয়েছিলেন সযত্নে, অল্পকালের মধ্যে ডিরোজিওর জীবনে সেই বীজই সোনার ফসল ফলিয়েছিল। যুক্তিবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া শিষ্য ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্র ডিরোজিওকে নবযুগের ন্যায়দর্শনে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ড্রামণ্ড নিজে কখনও কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না, নির্মম যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষায় তা যাচাই না করে গুরুর জীবনাদর্শের উত্তরাধিকার বহন করে ডিরোজিও তাই এদেশের তরুণদের শ্রেষ্ঠ কৃতী শিক্ষক হয়েছিলেন।

ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির সংবাদ 'ক্যালকাটা গেজেট', 'গবর্নমেণ্ট গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকায় মধ্যে-মধ্যে প্রকাশিত হত। ডিরোজিওর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা এইসব সংবাদ থেকে কিছু-কিছু জানা যায়। একবার আটবছর বয়সে তিনি আবৃত্তি-পাঠ, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ মেধা প্রদর্শনের জন্য একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই ধরনের কৃতিত্বের জন্য আরও একবার পুরস্কার পেয়েছিলেন ন-বছর বয়সে। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিদর্শনের জন্য তখন কলকাতার স্বনামধন্য সাহেবরা এই শ্রেণীর স্কুলে আমন্ত্রিত হতেন। ২০ ডিসেম্বর ১৮২২, একটি বাৎসরিক পরীক্ষায় তখনকার প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক জন গ্র্যাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষার পরে তিনি তাঁর পত্রিকায় লেখেন: 'বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে ইংরেজি আবৃত্তি করে ছাত্ররা যে অদ্ভুত কলাকৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এরজন্য কৃতিত্ব কেবল ছাত্রদের প্রাপ্য নয়, শিক্ষকেরও প্রাপ্য। ডিরোজিও

নামে একজন ছাত্র শেক্সপীয়রের শাইলক চরিত্রের এমন অপূর্ব চিত্র তার আবৃত্তির বাচনভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছিল, যা ঐ বয়সের স্কুলের ছাত্রের পক্ষে অভাবনীয় বলা চলে। কলম্যানের একটি হাস্য-কৌতুকের কবিতাও সে আবৃত্তি করেছিল চমৎকার হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে।' 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক গ্র্যাণ্ট সাহেবের সঙ্গে ডিরোজিওর তখনও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটেনি। ছাত্রজীবন শেষ হবার পরেই সেই সুযোগ ঘটে, এবং ডিরোজিওর সাহিত্যসাধনা ও সাংবাদিকতার প্রধান গুরু হয়ে ওঠেন গ্র্যাণ্ট সাহেব।

ধর্মতলা অ্যাকাডেমির আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ছাত্রদের কৃতিত্ব-প্রসঙ্গে গ্র্যাণ্ট উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন যে ড্রামণ্ডের স্কুলে এদেশী ও বিদেশী ইওরোপীয় ছাত্ররা পাশাপাশি বসে শিক্ষালাভ করছে দেখে খুবই আনন্দ হল। এইভাবে শিক্ষা পেলে উভয় দেশের লোকের মধ্যে বিদ্বেষভাব ও উচ্চনিচভাব অচিরেই দূর হয়ে যাবে। এ-কেবল ড্রামণ্ডের স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল না, অন্যান্য সাহেব-ফিরিঙ্গিদের স্কুলেরও ঐ একই বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তাতে গ্র্যাণ্টের আশা পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ উভয় দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ভেদবৈষম্যবোধ দূর হয়নি।

শেরবোর্নের স্কুলের মতো ড্রামণ্ডের স্কুলেও এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া করত। গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা হরিদাস বসু পাঁচবছর ড্রামণ্ডের স্কুলে লেখাপড়া করে যখন বিদায় নেন, তখন সেটা 'সংবাদ' হয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হরিদাস বসু বলেন, 'আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্মান্তরে প্রস্থান করি।' হরিদাসের মতো আরও অনেক ধনীর সন্তান, বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দিদের পুত্র ড্রামণ্ডের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করে কর্মান্তরে প্রস্থান করেছেন। বাংলা দেশের বালকদের সঙ্গে ডিরোজিওর বন্ধুত্ব ছাত্রজীবনেই হয়েছিল। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে দু-চারজন অন্তত বাঙালী ছিল বলে মনে হয়। বাল্যসঙ্গীরা বা সহপাঠীরা কেউ তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন

বলে জানা যায় না। তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডই তাঁর মানসক্ষেত্রে কর্ষণ করে নবযুগের দার্শনিক চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে ড্রামণ্ডের মতো একজন প্রকৃত শিক্ষক ও চরিত্রশিল্পীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে ডিরোজিও তাঁর স্বল্পস্থায়ী কর্মজীবনে মাত্র কয়েক-বছরের চেষ্টায় এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন।

বিদ্যালয়ের যিনি আদর্শ শিক্ষক তিনি বিদ্যা দান করেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দান করেন বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রেরণা। প্রায় আটবছর ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে বিদ্যাভ্যাস করলেও এবং ড্রামণ্ডের মতো বিদ্যাগতপ্রাণ শিক্ষকের সস্নেহ সংস্পর্শ পেলেও, ডিরোজিও যে সর্ববিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। চোদ্দবছরের কিশোরের পক্ষে কতদূরই বা বিদ্বান হওয়া সম্ভবপর! আটবছর ছাত্রজীবনের পর মাত্র আর আটবছর কর্মজীবন। তারপরেই ডিরোজিওর জীবনের অবসান। কাজকর্মের ফাঁকে এই আটবছর তিনি যথাসাধ্য জ্ঞানবিদ্যার সাধনা করেছিলেন। শিক্ষক-জীবনেও তাঁর নিজের শিক্ষার পালা শেষ হয়নি।

উইলে তালিকাবদ্ধ ডিরোজিওর জিনিসপত্র

৩. সামাজিক পরিবেশ

ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আঠার শতকের কলকাতার নাগরিক সমাজের মন্দগতি রূপান্তর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ক্লাইভ-হলওয়েল-ভ্যান্সিটার্ট-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসের যুগ অস্তাচলে গেছে, এবং তার সঙ্গে কালা-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র, মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল, অক্রূর দত্ত, রামদুলাল দে সরকার, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জি প্রভৃতি বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দি ব্যবসায়ীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির স্বর্ণযুগও কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। মনেহয়, সমগ্র আঠার শতকটা যেন কলকাতার মতো উদীয়মান মহানগরের আকাশে বিলীয়মান সামন্ত-যুগের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারই গোধূলিতে সমাজের রঙ্গমঞ্চে দৌরাত্ম্য করেছিলেন, ব্রিটিশের কলের পুতুল সেজে, সেকালের বাঙালী মুন্সী-মহারাজ, দালাল-গোমস্তা, ইজারাদার-বেনিয়ানের দল। উনিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁদের গতিবিধি মন্থর হয়ে এল, অনেকে মঞ্চ থেকে

প্রস্থানও করলেন। বংশানুক্রমে তাঁদের পুত্র-পৌত্ররা এলেন, সঞ্চিত পৈতৃক বিত্তের অপচয় করে এক বিচিত্র শহুরে বাবুসমাজ গড়ে তুললেন তাঁরা। ডিরোজিও যখন মৌলালি অঞ্চলে জন্মালেন, তখন প্রধানত উত্তর-কলকাতার দু-এক-পুরুষের ধনিক পরিবারের বংশলোচনরা বাবুরূপ বীজ থেকে কচি-কচি চারাগাছে অংকুরিত হয়ে উঠছেন। ডিরোজিও তাঁর যৌবনকালের মধ্যে এইসব চারাগাছকে বাবুবৃক্ষে পরিণত হতে দেখেছেন।

১৮০৯ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ডিরোজিওর স্কুলপূর্ব বাল্যকাল, এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাকাল। ১৮২৬ সালে সতের বছর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন, মধ্যে দু-এক বছর অন্য কাজ করেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত কয়েক বছরের সামাজিক অবস্থা হিন্দুকলেজে তাঁর কর্মজীবন প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই আলোচিত হবে। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের গঠনকাল হিসেবে প্রথম ষোল বছরের সামাজিক পরিবেশই প্রথম আলোচ্য। বাল্যকাল ও কৈশোরের পরিবেশ যে-কোনো মানুষের চরিত্র রূপায়ণে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে বেশি, ডিরোজিওর জীবনেও করেছিল। যৌবনে যখন সেই পরিবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় তখন ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাতের ভিতর দিয়ে সচেতন ব্যক্তি চেষ্টা করে সমাজের রূপ বদলাতে। ডিরোজিও নবযৌবনকালে তাই করেছিলেন। তখন তিনিও ছিলেন স্রষ্টা ও নির্মাতা, সমাজই কেবল সর্বশক্তিমান ছিল না। কিন্তু জীবনের প্রথম পনের-ষোল বছর মানুষের জীবনের নিয়ন্তা থাকে পরিবাব ও সমাজ। পরিবার যেহেতু সমাজের প্রতিচ্ছবি, তাই নিয়ন্তা কেবল সমাজকে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কী সেই সমাজ যা বালক ও কিশোর ডিরোজিওর চরিত্রকে বিদ্রোহের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে গড়ে তুলেছিল?

কলকাতা শহরের অর্ধগ্রাম্য রাস্তায় তখন হাতী চলে-ফিরে বেড়াচ্ছিল, কারণ সমাজে তখনও হাতীর প্রভুরা ছিলেন। মধ্যযুগের স্থূলতা মন্থরতা ও অচলতার প্রতাপ তখনও অখণ্ড না থাকলেও, একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। ধীরে হলেও তার প্রতিপত্তি খর্বিত হচ্ছিল নিশ্চয়। ডিরোজিও জন্মেছিলেন, গোড়াতেই বলেছি, বাবু-সমাজের অংকুরোদ্গমকালে। বাবুরা ছিলেন গতায়ু সমাজের ভুক্তাবশেষ, নবকলেবরে সুসজ্জিত হয়ে সমাজপ্রাঙ্গণে কিছুকালের

জন্য তাঁদের সশব্দ সমাগম হয়েছিল ইতিহাসের গতিপথের প্রতিবন্ধক-রূপে। ফিরিঙ্গিসমাজে জন্মেও এবং ড্রামণ্ডের স্কুলে শিক্ষা পেয়েও, ডিরোজিও তদানীন্তন বাবুবৃক্ষের সুপরিপক্ক ফল হয়ে পথের ধুলোয় ঝরে পড়তে পারতেন। কিন্তু জীর্ণপত্রের মতো ঝরে না পড়ে তিনি প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন সমাজে। কারণ ঝড়ের প্রত্যাশা সমাজমানসে তখন সঞ্চারিত হয়েছিল।

সামন্তযুগের সবচেয়ে কুৎসিত প্রথা গোলামির প্রাদুর্ভাব তখন পর্যন্ত কলকাতা শহরে যা ছিল তা বিস্ময়কর। সুপ্রিমকোর্টের একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে কলকাতায় দাসগোলামের বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৭৮৫ সালে উইলিয়ম জোন্স বলেন: 'এখানকার গোলামদের দুরবস্থার কথা যা আমি জানি তা এত মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। প্রতিদিন গোলামদের উপর যে-সব নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী আমার কানে পৌঁছয় তা শোনাও মহাপাপ বলে আমি মনে করি। এই জনবহুল কলকাতা শহরে শুনেছি এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোক খুব কমই আছেন যাঁর ঘরে অন্তত একটি ছেলে বা মেয়ে ক্রীতদাস নেই। খোঁজ করলে দেখা যাবে হয়ত নিদারুণ অন্নাভাবের জন্য গোলামটি এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এদেশে দারিদ্র্যই দাসত্বের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি কলকাতা শহর গোলাম কেনাবেচার একটা বড় আড়ৎ হয়ে উঠেছে। অনেকেই জানেন গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা-বোঝাই গোলাম দূর গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে নিয়ে আসা হয় বিক্রি করার জন্য। এইসব গোলাম ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশকেই তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়। আবার দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্টের সময় অনেক বাপ-মাও ছেলেমেয়েদের পণ্যের মতো গোলাম হিসেবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন।'

উইলিয়ম জোন্স এই মন্তব্য করেছিলেন আঠার শতকের শেষে। বাংলার বাইরে গোলাম রপ্তানি বন্ধ করার জন্য ১৭৯৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা একটি আদেশ জারী করেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এদেশে গোলাম কেনাবেচা নির্বিবাদে চলতে থাকে। বিধি-নিষেধের বহু ছিদ্রপথে মধ্যযুগের এই অভিশপ্ত প্রথা দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ পায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ দশক

পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকায় কলকাতা শহরের গোলামদের সম্বন্ধে নানারকমের খবর প্রকাশিত হয়। শহরের নতুন মনিবদের অত্যাচারের কাহিনী, অত্যাচারের ভয়ে ভৃত্য ও গোলামদের পলায়নের সংবাদ, পণ্যদ্রব্যের মতো গোলাম বেচাকেনার বিজ্ঞপ্তি, অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তির সামান্য মূল্যে পুত্রকন্যা বিক্রয়, অথবা ধর্মীয় অনুশাসনের দায়ে পুত্রকন্যাকে নৈবেদ্যের মতো উপঢৌকন, এ-সব প্রায় নিত্যসংবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিরোজিও তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই গোলামি-প্রথার বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। ১৮২৭ সালে আঠার বছর বয়সে ক্রীতদাসদের বন্দীজীবনের গভীর মর্মবেদনা তিনি কাব্যে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির করুণ কাকুতি তাঁর কবিতার অক্ষরে-অক্ষরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। কবি ক্যাম্পবেলের অবিস্মরণীয় উক্তি 'And as the Slave departs, the Man returns' উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন

> How felt he when he first was told
> A slave he ceased to be ;
> How proudly beat his heart, when first
> He knew that he was free !
> The noblest feelings of the soul
> To glow at once began ;
> He knelt no more ; his thoughts were raised ;
> He felt himself a man.
> He looked above—the breath of Heaven
> Around him freshly blew ;
> He smiled exultingly to see
> The wild birds as they flew.
> He looked upon the running stream
> That 'neath him rolled away ;
> Then thought on winds, and birds, and floods,
> And cried, "I'm free as they" !
> Oh Freedom ! there is somethnig dear

E'en in thy very name,
That lights the altar of the soul
With everlasting flame.
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !
And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free !
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And feeling for degraded man
Gives freedom to the slave.

কবিতার ভাব-অনুভাবগুলির মধ্যে ডিরোজিওর হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রীর অনুরণন শোনা যায়। কবি ডিরোজিও বলেছেন, গোলাম যখন জানতে পারল যে সে তার দাসত্বের নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন সে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল, তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে যেন তারার মতো ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল। কারও কাছে আর সে নতজানু হবে না, মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চচিন্তা করবে নির্ভীক বীরের মতো। এইকথা ভাবতে-ভাবতে একবার সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মুক্ত হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল তার মাথায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের ডানা-ঝাপ্‌টানি সে দেখতে লাগল। বহমান নদীর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। ভাবতে লাগল—এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী, এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত। মুক্তি ও স্বাধীনতা কথার মধ্যে না-জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে! তার নাম করলেই যেন আত্মার বেদীমূলে আলোর প্রদীপ জ্বলে ওঠে, অনির্বাণ তার দীপশিখা। 'স্বাধীনতা' নামের মাহাত্ম্য এমন যে-দেশপ্রেমিক তার পবিত্র নামে সঙ্কল্প করে তরবারি কোষমুক্ত করেন, তাঁর পরাজয় হয় না। যে-বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে, আত্মোৎসর্গের গৌরবে সেই বক্ষই টান-টান হয়ে ফুলে ওঠে। যে-হাত অত্যাচারীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে পরাধীন লাঞ্ছিত মানুষকে আত্মমর্যাদা

দান করতে পারে, সে হাত ধন্য!

'ক্রীতদাসের মুক্তি' কবিতার মধ্যে ডিরোজিওর জীবনের সমগ্র আদর্শটি এমন পরিপূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে যা আর কোথাও হয়নি। বর্বর দাসত্বের অনাদৃত কুৎসিত রূপ তিনি আশৈশব স্বচক্ষে দেখেছেন কলকাতা শহরে। কেবল দারিদ্র্যের জন্যই যে মানুষ দাসখত লিখে দিয়েছ তা নয়, ধর্মান্ধতার জন্যও যে কিভাবে এদেশের মানুষ অবলীলাক্রমে আত্মবিক্রয় করেছে ও করতে পারে তা-ও তিনি প্রত্যহ দেখেছেন। সর্বপ্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মন-প্রাণ তাই কিশোর বয়সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এবং সকল রকমের ব্যক্তিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে তিনি মানুষের অবাধ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু কর্মজীবনে এই স্বপ্নকেই তিনি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন।

ডিরোজিওর বাল্য ও কিশোর জীবনের পরিবেশ-পরিচয় শেষ হল না এখানে। তার বৈচিত্র্য ও বৈরূপ্যের আরও নানাদিক আছে। তার বিবরণ না দিলে তাঁর চরিত্র-গঠনের চিত্রশালার ধারণা পরিষ্কার হবে না। প্রথমেই ন্যায়-বিচারের ধারণার কথা মনে পড়ে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দেওয়া তখনকার ইংরেজ বিচারকদের কাছে সুবিচার বলে গণ্য হত। এই বিচারবোধ ও দণ্ডনীতি যে তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপ্রসূত ছিল না, সামাজিক প্রথাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আঠার শতকে তো বটেই, উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সেকালের পত্রিকায় কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারের যে-সব খবর ছাপা হত তা পাঠ করলে আজকের যে-কোনো লোক ভয়ে শিউরে উঠবেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে আদালতের সংবাদে দেখা যায় মুর, জেম্‌স, রায়ান নামে সাহেবদের নরহত্যার অপরাধে একবছর কারাদণ্ড ও কুড়ি টাকা জরিমানা করা হয়। কাউকে আবার একই অপরাধের জন্য একসপ্তাহ জেল ও একটাকা জরিমানা করা হয়। চুরির অপরাধে কানাই মিস্ত্রির হাত পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। জালিয়াতি ও প্রতারণার অপরাধে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয় অনেক অপরাধীকে। একসময় ইংরেজরা চাবুক মেরে অপরাধীদের প্রকাশ্যে পথের উপর লোকসমক্ষে ফাঁসী দিতেন। তাতেও যথেষ্ট দণ্ড দেওয়া

হয় না মনে করে তাঁরা ঠিক করেন যে অতঃপর বেত্রাঘাত করে অপরাধীকে কামানের মুখে বসিয়ে সোজা উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই বিচারবোধ ইংরেজরা ইংলণ্ড থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এদেশের কাজীর বিচার অথবা দণ্ডনায়কের বিচার থেকে গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ মধ্যযুগের নীতিবোধ ও আইনকানুনের জঙ্গল থেকে এদেশের লোকের মতো ইংরেজরাও তখনও পর্যন্ত পরিত্রাণ পাননি। বিচারের এই বিসদৃশ বিশৃংখলাকে ট্রেভেলিয়ান 'illogical chaos of law' বলে অভিহিত করেছেন। ন্যায়বিচারের এই অর্ধ-বর্বর প্রহসন ডিরোজিও বাল্যকাল থেকে দেখেছেন কলকাতা শহরে। এ-ও যে মধ্যযুগের মানসিক জাড্যের ভস্মাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয় তা-ও তিনি উপলব্ধি করেছেন ধীরে-ধীরে।

কেবল বিচারকদের নয়, ইংরেজ পুলিশের অবস্থাও তখন খুব শোচনীয় ছিল। এদেশের জাদুমন্ত্র তুকতাক নলচালা বাটিচালা ইত্যাদি আধিভৌতিক কৌশলের সাহায্য নিয়ে চোর-জুয়াচোর সন্ধান করতে ইংরেজ পুলিশবা আদৌ দ্বিধা করতেন না। আঠার শতকের শেষে টমাস মট্ নামে এক সাহেব কলকাতার পুলিশ-সুপার ছিলেন। চোরডাকাত ধরার জাদুকরী কৌশলের জন্য তিনি 'জাদুকর মট্' বলে খ্যাত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সেপাইদের শহরের লোক 'Motte's conjurors' বলত। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত অন্তত কলকাতার পুলিশের মধ্যে জাদুকর মটের শিষ্য-প্রশিষ্যের অভাব ছিল না। শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দেও কলকাতার পুলিশকে চালপড়ার সাহায্যে চোর ধরতে দেখেছেন। চৌরঙ্গিতে তাঁর নিজের বাড়িতেই এই পদ্ধতিতে চোর ধরার একটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। চালপড়া ও নলচালার সাহায্যে কলকাতার ইংরেজ পুলিশদের চোব ধরার দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ বাল্যকাল থেকে ডিরোজিও যথেষ্ট পেয়েছিলেন। এদেশের মনোভূমিতে মধ্যযুগের নানারকম ভূতপ্রেত দৈত্যের তাণ্ডবনৃত্য দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে গেছেন। ইংরেজদেরও স্কন্ধে চেপে সেই দৈত্যরা দৌরাত্ম্য করছে দেখে তিনি আরও অবাক হয়েছেন নিশ্চয়। তার উপর হিউমপন্থী গুরু ডেভিড ড্রামণ্ডের শিক্ষায় মানুষের মনের এই শ্মশানদৃশ্য তাঁর কাছে যে কী বীভৎস ও ভয়াবহ মনে হয়েছে তা ভাবা যায় না।

কলকাতা শহরে তখন বিপুলকায় মেদবহুল রাজা-মহারাজা বেনিয়ান-ইজারাদারদের জীবনযাত্রা ছিল সর্বক্ষেত্রে ইংরেজ মহাপ্রভুদের অনুগামী। গৃহের আসবাবপত্তরে, দাসদাসীর সমাবেশে, ভোজসভার নৃত্যগীত সমারোহে, উৎসপার্বণের কৃত্রিম বিলাসে, এদেশীয় সমাজের নব্যপ্রধানেরা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোকচক্ষে সামাজিক মর্যাদালাভের জন্য তখন অত্যধিক লালায়িত হয়েছিলেন।

সমগ্র আঠার শতক ধরে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া বাঙালীর সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রকট হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রকার ও স্মৃতিকারেরা যত বেশি কঠোর নিয়মের লৌহশৃংখলে পদস্খলিত নীতিভ্রষ্ট সমাজকে বাঁধতে চাইছিলেন, ততই যেন 'বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো'র মতো সমাজের স্খলন-পতন-চ্যুতি ও অধোগতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ বাল্য-বিবাহ পৌত্তলিকতা প্রভৃতি যাবতীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সমাজে। সহমরণ ও সতীদাহের মতো বীভৎস প্রথাও উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজে যেভাবে প্রসারলাভ করেছিল, তা থেকে অজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার গাঢ় অন্ধকার যে দেশবাসীর মন ও বুদ্ধিকে কতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা খানিকটা অনুমান করা যায়। ডিরোজিও যখন এই নতুন মহানগরে জন্মগ্রহণ করেন তখন এই ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি নিমজ্জিত হয়েছিল। ভেলার মতো কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিল ধর্মোন্মত্ত বিকলচিত্ত, বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির ও দৃষ্টির কোনো কাণ্ডারী ছিল না তাতে।

কৃষ্ণপক্ষের রাতের মতো বাংলা দেশের জীবনে গোটা আঠার শতকটাই পর্বে-পর্বে যেন অন্ধকারের প্রহর অতিক্রম করে চলেছিল। সেই অন্ধকারে কেবল ধ্বনিত হচ্ছিল অর্থলোলুপদের সোরগোল, বিদেশী ও স্বদেশী উভয়-দলের। তার মধ্যে শিক্ষার বাসনা ছিল না, জ্ঞানবিদ্যা ও সংস্কৃত চর্চার প্রতি অনুরাগ তো দূরের কথা বরং বিরাগই ছিল এবং দেশীয় মহান ঐতিহ্য যা-কিছু তা যে বিস্মৃতির কোন্ অতল তিমিরে তলিয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। বিদেশী রাইটার, জুনিয়র-সিনিয়র মার্চেন্ট, ফ্যাক্টর, এজেন্ট থেকে কৌন্সিলের সদস্য, প্রেসিডেন্ট, গবর্নর পর্যন্ত সকলেই ছিলেন টাকার ধান্ধায়

উন্মত্ত, দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য। তাঁদের এদেশী প্রতিবিম্বরা, অর্থাৎ নতুন বাঙালী (এবং অবাঙালীও) ধনাঢ্যরা বিদেশী প্রভুদের পদাংক অনুসরণ করার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন পদে-পদে। এই সব নব্য বাঙালী রাজা-মহারাজা-মুন্সী দেওয়ান-বেনিয়ানদের তাৎকালিক বিকৃত সাংস্কৃতিক আচরণের একটি হলওয়েল বর্ণিত 'জেণ্টুদের দুর্গোৎসব'।[১] শিক্ষা-সংস্কৃতিক্ষেত্রে আঠার শতকের একমাত্র ক্ষীণ আলোকরশ্মি হল, ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাংলা 'এসিয়াটিক সোসাইটি', কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে তখন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছিল তা সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা শহরের মাত্র ত্রিশজন ইয়োরোপীয়ের মধ্যে।[২] এই ত্রিশজনের মধ্যে সকলে যে প্রাচ্যবিদ উইলিয়ম জোন্সের মতো বিদ্যানুরাগী ছিলেন তা নয়, সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের জোরেও অনেকে এই বিদ্বৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বাঙালী ও ভারতীয়ের জীবনের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব ছিল না, অন্তত আঠার শতকে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের কক্ষেই এই আলোকরশ্মি আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রির পর আলোকোজ্জ্বল দিন আসে যেমন, ঠিক তেমনি সহজ স্বাভাবিক নিয়মে না হলেও, কতকটা অনুরূপ ঐতিহাসিক আবর্তনের ছন্দে সামাজিক অন্ধকার-যুগের পর নতুন আলোর ও আশার সম্ভাবনা নিয়ে নবযুগের অভ্যুদয় হয়। আঠার শতকের পর উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল নতুন সম্ভাবনা নিয়ে।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিও যখন জন্মগ্রহণ করেন, রামমোহন রায় তখনও বাংলার নতুন রাজধানী কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেননি। বালক ডিরোজিও যখন ড্রামণ্ডের স্কুলে ভর্তি হন, সেই সময় ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আট-নয় বছর ডিরোজিও যখন ড্রামণ্ডের স্কুলে লেখাপড়া

১ বিনয় ঘোষ: 'কলকাতা কালচার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২ "Thirty Gentlemen attended this meeting, (১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪, বৃহস্পতিবার এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আহূত প্রথম সভা) and they represented the *elite* of the European Community in Calcutta at the time". (Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, 1784-1883—Part 1, History of the Society, by Rajendralal Mitra)।

শিখেছিলেন, রামমোহন তখন ধীরে-ধীরে নবযুগের আদর্শ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিওর যখন বর্ণপরিচয় হচ্ছে ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে, রামমোহন তখন কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে এবং অনুবাদ ও ভাষ্যসহ 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করে সমাজে প্রথম কলগুঞ্জনের সৃষ্টি করছেন।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিও যখন ন-বছরের ছাত্র, রামমোহন তখন সহমরণ বিষয়ে তাঁর প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ লিখে প্রকাশ করেন।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে চোদ্দবছর বয়সে ডিরোজিও বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। তখন তাঁর পূর্ণ কৈশোর, এবং নব্যবাবুদের কলকাতা শহরে তাঁর সামনে পাতাল-বিস্তৃত পিচ্ছিল পতনের পথ। আরও একটি দুর্গম পথ বহুবাধা অপসারণ করে রামমোহন তখন নির্মাণ করছিলেন বটে, কিন্তু তা যেমন চড়াইবহুল তেমনি কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসংকুল। এর যে-কোনো একটি পথ ধরে ফিরিঙ্গি-সন্তান ডিরোজিওকেও তখন যাত্রা করতে হবে।

যে-সমাজে ডিরোজিওর বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবনের প্রথমপর্ব কেটেছিল তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল এইরকম।* এই ধরনের সমাজে সচেতন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় দুই প্রকারের—হ্যাঁ-ব্যক্তিত্ব ও না-ব্যক্তিত্ব। সমাজের প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার মাথা হেঁট করে মেনে চলতে রাজী না, শাস্ত্রমত বলে গৃহীত বিধিনিষেধ আচরণীয় বলে স্বীকার করতে সম্মত না, বুদ্ধি ও যুক্তির অগম্য যা তা সত্য বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছুক না, কোনো শাসন অনুশাসনকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিচার-বুদ্ধির চেয়ে বড় সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য না—সামাজিক পরিবেষ্টনের একটা সীমিত স্তরে তখন এইরকম 'না-না' আর 'না'-র বিস্ফোরক বারুদ দিয়ে ঠাসা। সমাজের এই স্তরে অগণিত 'না'-এর বারুদের মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত হয়ে ডিরোজিওর মনপ্রাণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে চারিদিক বিদীর্ণ করে যেন ফেটে পড়তে চেয়েছিল।

* বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ১৮০০-১৯০০
বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ) সামাজিক পরিবেশের বিস্তারিত পরিচয় এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে।

৪. কর্মজীবন

বিদ্যালয় ছেড়ে প্রথমে ডিরোজিও বছর দুই সদাগরী অফিসে কেরানীর চাকরি করেন। কিন্তু চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে কেরানীর একঘেয়ে কলমপেশার কাজ করতে কোনো তরুণেরই ভাল লাগার কথা নয়, তাঁরও ভাল লাগেনি। চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরে কিছুদিনের জন্য তিনি বেড়াতে যান তাঁর মাসিমার কাছে। সেখানে তাঁর মেসোমশায় জনসন সাহেব নীলকুঠির মালিক ছিলেন! নীলচাষের বড় কেন্দ্র ছিল তখন ভাগলপুর অঞ্চল। নীল-ব্যবসায়ে মুনাফাও ছিল যথেষ্ট। কুঠিয়াল জনসনের অর্থের অভাব ছিল না। পরম নিশ্চিন্তে, প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, কিছুদিন তাঁদের স্নেহাশ্রয়ে থাকার সুযোগ পেয়ে ডিরোজিওর কিশোরচিত্ত কাব্যিক প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তখন তাঁর বয়স বছর ষোল। ভাগলপুর অঞ্চলের পাহাড় নদী বন উপবন তাঁর কাব্যপ্রতিভার মুকুলটিকে অগোচরে ফুটিয়ে তুলল। গঙ্গার তরঙ্গ-প্রবাহ এবং মুঙ্গের ভাগলপুর ড্যাল্‌টনগঞ্জের

গিরিশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ডিরোজিও তন্ময় হয়ে যেতেন কাব্যিক কল্পনায়। তাঁর কিশোর-কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত শব্দের ছন্দে

> Ye waters-bright that beneath me roll !
> Tell me, where is the light of my soul—
> On the mountain-top, on the boundless main
> By the pebbly beach, or the desert plain ?

এই কাতর আকুলতা 'The Maniac Widow'-র বেদনার প্রকাশ হলেও এর ভিতর দিয়ে ডিরোজিওর নিজের প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। কিশোর কবি বিধবার অন্তরের কথায় নিজেরই মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন।

এইভাবে কবিতা লিখে এবং সদ্যোজাগ্রত কাব্যিক অনুভূতি দিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ উপভোগ করে ডিরোজিওর ভাগলপুরের দিনগুলি নিশ্চিন্তে কেটে যেত। কলকাতায় 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক গ্র্যাণ্টের কাছে কবিতাগুলি তিনি পাঠিয়ে দিতেন। Juvenis ছদ্মনামে তাঁর অনেক কবিতা ও সাহিত্যরচনা 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছে। গ্র্যাণ্টের সঙ্গে এইসময় থেকে লেখার 'সূত্রে একটা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তাঁর গড়ে উঠেছিল। প্রধানত গ্র্যাণ্টের পোষকতায় ও উৎসাহে তাঁর কাব্য ও সাহিত্য অনুশীলন অবাধে চলতে থাকে, সাংবাদিকতার কলাকৌশলও তিনি আয়ত্ত করেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই সুধীমহলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মনেহয় বছরখানেকের বেশি ভাগলপুরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি কলকাতার হিন্দুকলেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। সংবাদটি এই

> ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।*

হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে ডিরোজিও নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স সতের বছর।

১৮১৭, ২০ জানুয়ারি হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান হল হিন্দুকলেজ।

---

* সমাচার দর্পণ, ১৩ মে ১৮২৬

আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে' সিলেক্ট কমিটি'র কাছে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'It was the very first English Seminary in Bengal, or even in India, as far as I know.' হিন্দুকলেজ তখন 'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' দুইভাগে বিভক্ত ছিল, একটিকে 'পাঠশালা' ও আর-একটিকে 'মহাপাঠশালা' বলা হত। জাস্টিস হাইড ইস্ট ও ডেভিড হেয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উদযোগী হলেও, প্রধানত সম্ভ্রান্ত বাঙালীরাই এই ধরনের ইংরেজি শিক্ষার একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করে পরম উৎসাহে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের সকলেরই প্রায় ছিল বলে, সরকারী পোষকতার চিন্তা প্রারম্ভেই তাঁদের করতে হয়নি। বিশিষ্ট বাঙালী-প্রধান 'ম্যানেজিং কমিটি' বা 'অধ্যক্ষসভা'র অধীনে সূচনা থেকেই হিন্দুকলেজ অবাধে তার উদ্দেশ্য-সাধনের পথে যাত্রা করতে পেরেছিল। কলেজের 'গভর্নর' ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর। কিছুদিন পরে কমিটি যখন সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন তখন কলেজের একজন 'ভিজিটার' বা 'পরিদর্শক' নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ উইলসন কলেজের পরিদর্শক-পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হিন্দুকলেজ যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন এদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে তো নয়ই, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও ইংরেজিশিক্ষার আগ্রহ তেমন জাগেনি। উচ্চশ্রেণীর অতি সংকীর্ণ একটা গোষ্ঠীর মধ্যে এই আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, বিশেষ করে ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে ইংরেজের প্রসাদলাভের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আর্থিক ক্ষেত্রে যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে। ইংরেজি তখন সরকারী ভাষা বলে এদেশে গৃহীত হয়নি, কেবল আইন-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধা-সরকারীভাবে চলিত হয়েছে। সে-সব ক্ষেত্রেও যেখানে ইংরেজের সান্নিধ্যে আসতে হত, কেবল সেখানেই যৎসামান্য ইংরেজিজ্ঞানের আবশ্যক হত। সুতরাং হিন্দুকলেজের আদিকালে, উনিশ শতকের প্রথমপর্বে, যদি দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষার আবশ্যকতাবোধ না জেগে থাকে তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শোনা যায়, প্রথমে জন কুড়ি ছাত্র নিয়ে কলেজের ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল। তখনকার দিনে এই কুড়িজনকেই 'অনেক' বলতে হবে। কুড়িজন থেকে ধীরে-ধীরে

পাঁচ-ছ-বছরে ছাত্রসংখ্যা ষাট-সত্তরজন পর্যন্ত হয়। এই বৃদ্ধি খুব আশাপ্রদ না হলেও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু ক্রমেই 'অধ্যক্ষসভা'র সভ্যদের নানাবিষয়ে মতানৈক্যের জন্য বিদ্যালয়ের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ইংরেজ সদস্যরা অনেকেই বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন, শুধু ডেভিড হেয়ার হাল ছাড়েননি। ১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। এই সময় ডেভিড হেয়ার উদ্‌যোগী হয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। এর পর থেকেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য 'ভিজিটর' নিযুক্ত হন। ডাফ বলেছেন, 'and it was in this way that the British Government was first brought into active participation in the cause of English Education.'

হেয়ারের পরিদর্শনের আমলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হতে থাকে এবং উইলসনের দূরদর্শিতার ফলে তার উন্নতির পথের বহু বাধাবিপত্তি অপসারিত হয়ে যায়। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্যপ্রসঙ্গে উইলসন বলেন, 'The general result of the operations of the Hindu College is to give the students a considerable command of the English language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Science'. ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে, ইতিহাসে, ভূগোলে ও বিজ্ঞানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুকলেজের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকরা এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা হিন্দুস্থানের নব্যশিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুকলেজ হবে, 'The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan,'—এই ছিল পরিকল্পকদের বাসনা।

বিদ্যালয়ের এই উদ্দেশ্য বা আদর্শ কোনো কিছুর সঙ্গেই তরুণ ডিরোজিওর আদৌ কোনো বিরোধ ছিল না। যখন তিনি কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন, উইলসন তখন পরিদর্শক। পরিদর্শকের বাৎসরিক বিবরণীতে হিন্দুকলেজের এই উদ্দেশ্য তিনি বারংবার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তরুণ-কবি

ডিরোজিওর কৈশোরের স্বপ্ন নব্যশিক্ষার এই অনুকূল পরিবেশে বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠার জন্য যদি ব্যাকুল হয়ে থাকে তাহলে তা অস্বাভাবিক হয়নি। অথচ কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হবার পর মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ঘটনাচক্রে আদর্শচ্যুতির অপরাধে তাঁর পদচ্যুতি ঘটল। নবযুগের সত্যকার আদর্শকে ডিরোজিও যখন চোখের সামনে তুলে ধরলেন, তখন তার প্রকৃত রূপ দেখে কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ডিরোজিও তাঁদের সেই সন্ত্রাসে অগ্নিসংযোগ করলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের শিক্ষার মান ও অগ্রগতি যে অব্যাহত ছিল তা উইলসনের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে, পরীক্ষা রীতিমত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও, উইলসন সিনিয়র ছাত্রদের ইংরেজি রচনাশক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি রিপোর্টে লেখেন যে কলেজের প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা পোপের কবিতা, মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' এবং সেক্সপীয়রের ভাল-ভাল নাটকগুলি সম্বন্ধে বেশ চমৎকার জ্ঞানলাভ করেছে। এ-ছাড়া তিনি লিখেছেন, ইতিহাস দর্শন গণিত ও বিজ্ঞানেও তারা বেশ ভাল শিক্ষা পেয়েছে মনে হয়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে উইলসন যখন পরিদর্শক নিযুক্ত হন তখন প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা Tegg-এর Book of Knowledge এবং Enfield-এর Speaker পাঠ করত, এবং তাতে যেটুকু শিক্ষা তাদের হত তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা এখন (১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে) পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররাই পেয়ে থাকে। আর এখনকার প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে আগেকার প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদের কোনো তুলনাই হয় না : 'Whilst those of the present first class, admit of no comparison with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained.' ছাত্রদের কৃতিত্ব উইলসনের নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছিল।

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হবার পর প্রায় সাত-আট বছরের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বিশেষ বাড়েনি বললেই হয়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছাত্র-সংখ্যা গড়ে একশতের বেশি ছিল না, তার মধ্যে ২৫ জন ছিল পে-স্কলার, বাকি সকলে বিনা বেতনে পড়ত। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে পে-স্কলারের সংখ্যা

ধীরে-ধীরে বেড়ে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের শেষে ২২৩ জন, ১৮২৭-এর শেষে ৩০০ জন এবং ১৮২৮-এর শেষে ৩৩৬ জন হয়। মোট ছাত্রসংখ্যা ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৪৩৬ জন। ১৮৫০-৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায় পে-স্কলারের সংখ্যা গড়ে ৪৫০ জনের বেশি হয়নি। কিন্তু হঠাৎ ১৮২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে দেখা যায়, দু-তিন বছর ধরে ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কমতে থাকে।

এর কারণ বিশ্লেষণ করে (J. Kerr) সাহেব বলেছেন

> The falling off…was supposed to be owing partly to the establishment of other schools, partly to the commercial distress which prevailed at that period, and partly to a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys who, under the influence of Mr. Derozio, were fast losing their respect for the venerable customs of their forefathers.

অন্যান্য আরও স্কুল প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সংকটের কথা কের সাহেব হিন্দু-কলেজের ক্রমাবনতির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ হল, শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবৃন্দকে কেন্দ্র করে তখন কলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে অভিভাবকরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিক্ষোভের এই ঝড় বয়ে গিয়েছিল কলকাতায়।

কিন্তু হঠাৎ কি কারণে এমন অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি হল, যার জন্য দু-একবছরের মধ্যে তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও সমগ্র হিন্দুসমাজের সামনে অপরাধীর বেশে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। পরিদর্শকের রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে ডিরোজিওর আমলে কলেজের ক্রমিক উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি। শিক্ষার মানের দিক থেকে বিচার করে, এবং ইংরেজি দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে ছাত্রদের উন্নতি লক্ষ্য করে উইলসন নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু যে শিক্ষার মান উন্নীত হয়েছিল তা নয়, বিদ্যালয়ের বৈতনিক ছাত্রসংখ্যাও ডিরোজিওর আমলে দু-তিনবছরের মধ্যে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডিরোজিওর

শিক্ষানীতির উপর অভিভাবক ও ছাত্রদের যদি আশানুরূপ আস্থা না থাকত তাহলে বোধহয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বাড়ত না। এই কারণেই প্রশ্ন জাগে মনে যে হঠাৎ কোথা থেকে কি এমন কারণের উৎপত্তি হল যাতে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠল ডিরোজিওর বিরুদ্ধে, এবং অবশেষে তাঁরই মাথার উপর গোঁড়া হিন্দুসমাজের পুঞ্জীভূত আক্রোশের মেঘ সশব্দে ফেটে পড়ল ?

যদিও ড্রামণ্ডের মতো ডিরোজিওর সমাধি-ফলকে তাঁর শিক্ষকতার কোনো গুণের কথা খোদাই করা নেই, তা হলেও গুরু ড্রামণ্ডের মতোই ডিরোজিও ছিলেন—'a successful teacher of youth'—তরুণদের একজন সার্থক শিক্ষক। হিন্দুকলেজে আরও অনেক শিক্ষক ছিলেন, কোনো-কোনো বিষয়ে ডিরোজিওর চেয়ে তাঁরা হয়ত অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানীগুণী ছিলেন, ভাল পড়াতেও পারতেন। কিন্তু কলেজের রেজিস্টার-খাতায় ছাড়া—ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কোনো স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। তার কারণ বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য নিষ্ঠা কর্মক্ষমতা সব তাঁদের থাকলেও, ডিরোজিওর মতো ব্যক্তিত্ব ও চুম্বক-চরিত্র ছিল না। তাঁদের পাণ্ডিত্যের ওজন ছিল, কিন্তু তাতে প্রতিভার দীপ্তি ছিল না। পাণ্ডিত্যের ভারের চেয়ে ডিরোজিওর প্রতিভার দীপ্তি ছিল বেশি, তাই বিদ্যা যেটুকু তাঁর ছিল তা প্রতিভার মন্ত্রস্পর্শে জ্বলে উঠত চকমকির মতো। ছাত্ররা যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসত তারা কেবল বিদ্যার হিমশীতল পাথুরে চাপ সহ্য করত না, প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গের উত্তাপও অনুভব করত। গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে তো নিশ্চয়ই—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও যেখানে কেবল বাধ্যবাধকতার চাপ থাকে, মনের কোনো তাপ থাকে না, সেখানে পরস্পরের বন্ধন কদাচ অকৃত্রিম হয় না, এবং স্বাভাবিক কারণেই তা হতে পারে না। ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা অকৃত্রিম মানবিক বন্ধনের মতো অন্তরঙ্গ ছিল বলেই বাইরের জনসমাজে তার প্রকাশ হয়েছিল চোখঝল্‌সানো বিদ্যুৎচমকে।

ডিরোজিওর নিজের ছাত্ররাই এই মানবিক সম্পর্কের কিছু-কিছু বিবরণ দিয়ে গেছেন। রাধানাথ শিকদার লিখেছেন যে ডিরোজিওর সামান্য বিদ্যাভিমান থাকলেও, তাঁর মতো সহানুভূতিশীল স্নেহপ্রবণ শিক্ষক তখনকার শিক্ষায়তনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আগে

তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি। ছাত্ররা তাতে যে কত লাভবান হত তা বলা যায় না। কেবল বিদ্যাশিক্ষা করেই তারা ক্ষান্ত হত না, বাস্তব জীবনে ও সমাজে তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তারা চঞ্চল হয়ে উঠত। আর-কোনো শিক্ষক ছাত্রদের মনে এরকম প্রেরণা জাগাতে পারতেন না। রাধানাথ নিজে তাঁর কাছে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে শুধু বিভিন্ন পুথিগত বিদ্যাতেই তাঁদের শিক্ষা শেষ হয়ে যায়নি। মানুষের জীবনের সবচেয়ে যে মহৎ শিক্ষা সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, তা-ও তাঁরা তাঁদের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

ডিরোজিওর ছাত্র নন, অথচ সেকালের একজন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী, হিন্দুসমাজ-পরিত্যক্ত আর-একজন প্রতিভাবান বাঙালী সন্তান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ডিরোজিওর মৃত্যুর বছর তিনেক পরে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে লালবিহারী দে, লেখাপড়া শেখার জন্য প্রথম কলকাতায় আসেন। ডিরোজীয়ান যুগের কলরব তখনও শান্ত হয়নি। গুরুর মৃত্যুর পর 'ইয়ং বেঙ্গল' দল দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর আদর্শ প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারুণ্যের উৎসাহে এই পরিবেশের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ছিল লালবিহারী দে'র। ডিরোজিও সম্বন্ধে নানারকমের কথা তিনি তাঁর ছাত্রদের মুখ থেকে শুনেছিলেন। তিনি লিখেছেন

> 'হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা বেকন (Bacon), লক (Locke), বার্কলে (Berkeley, হিউম (Hume), রীড (Reid), স্টুয়ার্ট (Stewart), প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। এই পরিচয়ের ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করতে ও তর্ক করতে আরম্ভ করেন। তার ফলে তাঁদের অনেক প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার মূল নড়ে যায়, বহুকালের বাছা-বাছা সব আস্থার স্তম্ভ টলমল করে ওঠে। এই নতুন শিক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু ছিলেন ডিরোজিও। হিন্দুকলেজে তিনি ছাত্রদের যে ক্লাস করতেন তার

আবহাওয়াই ছিল অন্যরকম। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে শিক্ষার যে নতুন আস্বাদ পেতেন তা আর কোথাও বিশেষ পাওয়া যেত না। ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল, ছাত্রদের মনে তীব্র জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। হয়ত ছোট বিষয়ের সঙ্গে বড় বিষয়ের তুলনা করা হবে, কিন্তু তা হলেও ডিরোজিওর ক্লাসের সঙ্গে একমাত্র প্লেটো ও আরিস্ততলের 'আকাডেমি'র তুলনা করা যায়। ক্লাসরুমের বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে স্বভাবতঃই বিষয়ালোচনার স্বাচ্ছন্দ্য ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন হত। ডিরোজিও তাই কলেজের বাইরে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ছাত্রদের আহ্বান করতেন। সেখানকার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে আলোচনা আরও ভালভাবে জমে উঠত, শিক্ষক ও তাঁর ছাত্ররা সকলেই মন খুলে অবাধে কথাবার্তা বলার সুযোগ পেতেন। কিছুদিনের মধ্যে বৈঠকখানার পরিবেশও আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয় মনে হল। তখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে বাইরে একটি পাঠচক্র ও বিতর্কসভা গড়ে তুললেন।'

ডিরোজিও কি শিক্ষা দিতেন ও কেমন করে শিক্ষা দিতেন তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষক বয়সে মাত্র তিন-চার বছরের বড় ছিলেন, প্রাচীনকালের প্রবীণ গুরুমশায় ও ঋষিদের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। বিদ্যাভিমান খানিকটা ডিরোজিওর ছিল বলে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ-কেউ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেই অভিমানের প্রাচীর তুলে তিনি ছাত্রদের কখনও দূরে ঠেলে রাখেননি। বয়সের দিক থেকে ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশার তাঁর যে সুযোগ ছিল, তার সদ্ব্যবহার তিনি পূর্ণমাত্রায় করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেছে তাঁর দিকে, কোনো সংকোচ বা বাধা মানেনি। শিক্ষকের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব ছাত্রদের মনে তাই অমন করে দাগ কেটে গেছে। ডিরোজিওর ছাত্ররা তাই যে কেবল সুশিক্ষিত হয়েছেন তা নয়, সমাজে চরিত্রবান বলিষ্ঠ মানুষ হিসেবেও সমাদর পেয়েছেন।

ডিরোজিওর এই শিক্ষাপদ্ধতির অভিনবত্ব কি? অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্যই বা কোথায়? পুঁথিগত বিদ্যা কোনরকমে ছাত্রদের মাথায় ঠেসে

দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না ডিরোজিও। মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাসমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতায় লটারীর মতো জয়লাভ করার যে আদর্শ, ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে তা আদৌ পছন্দ করতেন না, অথবা ছাত্র হিসেবে ছাত্রদেরও তার প্রতি অনুরাগী হতে উপদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানবিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হওয়া উচিত। শিক্ষক-জীবনে তিনি এই আদর্শই মেনে চলতেন। দর্শন সাহিত্য বা যে-কোনো বিষয় নিয়ে যখন তিনি আলোচনা করতেন, তখন পাঠ্য-পুস্তকের সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে বিষয়বস্তুর অনন্ত দিগন্তে একটার পর একটা রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে-করতে তিনি যেন অভিযান করতেন মনে হয়। আলোচনার আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে তিনি বিস্মৃত হতেন তাঁর গতানুগতিক কর্তব্যের কথা। ছাত্ররাও ভুলে যেত ক্লাসের ও পাঠ্যবস্তুর বন্ধনের কথা। মনে তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঢেউ উঠত, অজানাকে জানার, অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার ব্যাকুলতা বাড়ত। সোৎসাহে তারা প্রশ্ন করত, নানাদিক থেকে নানারকমের প্রশ্ন। ডিরোজিও সেই উৎসাহে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাতেন। সর্বদা শিক্ষকই যে সব প্রশ্নের জবাব দিতেন তা নয়, ছাত্ররা নিজেরা প্রশ্ন করে নিজেরাই তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করত। এই বন্ধনহীন বিষয়ালোচনার মধ্যে ডিরোজিওর ক্লাসটিকে আর কলেজের বাঁধাধরা ক্লাস বলে মনে হত না, বিতর্কসভা বলে মনে হত। শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই ডিরোজিও তরুণ বয়সে বাংলার নবীন ছাত্রসমাজে অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এই ধরনের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পক্ষে কলেজের ক্লাসরুম ক্রমে সংকীর্ণ মনে হতে লাগল। কলেজ থেকে ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানায় আলোচনাসভা স্থানান্তরিত হল। তাতেও আলোচনার আশানুরূপ স্ফূর্তি সম্ভব হল না। অবশেষে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ির ঘরে, সভার নিয়মিত বৈঠক বসতে আরম্ভ করল। সভার নাম দেওয়া হল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association)। মনে হয় ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই এই আলোচনাসভার ঘরোয়া বৈঠক নিয়মিতভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এই 'অ্যাকাডেমিকে'র খ্যাতি ও প্রভাব বাইরে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল দেখা যায়। বাগানবাড়ির

নিভৃত গৃহকোণ থেকে বাইরের বৃহত্তর সমাজের মুক্ত প্রাঙ্গণে রীতিমত সোরগোল তুলেছিল তরুণ ছাত্রদের এই বিদ্বৎসভা। বিচক্ষণ প্রবীণ প্রাজ্ঞরাও তরুণদের এই সভায় যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। বেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন

> In this grove of Academus, and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution, did the choice spirits of Young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions.... The young lions of the Academy roared out week after week 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy'.

বাংলার তরুণ সিংহশাবকদের গগনভেদী গর্জন শোনা যেত মানিকতলার বাগানবাড়িতে, যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও নোংরামির বিরুদ্ধে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক ও মানসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে, এমন কি মধ্যে-মধ্যে দেবতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে পর্যন্ত। ঘরে-বাইরে তার প্রতিধ্বনি হত। ঘর কাঁপত, সমাজও কাঁপত।

সদাপ্রসন্নমুখ ডেভিড হেয়ার আসতেন সবুজরঙের কোট পরে যুবক সেজে। যৌবনসুলভ সরলতা তাঁর চলাফেরায় পদে-পদে ফুটে উঠলেও, তরুণ ডিরোজীয়ানদের সভায় যোগদান করে তিনি যেন তারুণ্যের স্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি আসতেন, বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ মিল্‌স সাহেব আসতেন, কলকাতার সুপ্রিমকোর্টের চীফ-জাস্টিস আসতেন। বিদ্যোৎসাহী আরও অনেকে আসতেন প্রলুব্ধ হয়ে, বাধা মানতেন না। ডিরোজিও সভাপতি, সম্পাদক উমাচরণ বসু। সদস্য ও বক্তাদের মধ্যে প্রতিভাবান হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল

ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং ডিরোজিওর অন্যান্য প্রিয় ছাত্ররা। সভা কিভাবে পরিচালনা করা হত তার বিবরণ দিয়ে গেছেন প্রত্যক্ষদর্শী আলেকজাণ্ডার ডাফ। তিনি লিখেছেন

> Opportunities were constantly presented for the advancement of counteracting statements and opinions on almost all subjects. When a topic for debate was selected, individuals were not appointed to open the discussion on either side as is customary in this country. Their theory was, that, as professing inquiries after truth, they ought not to do violence to anyone's conscience, by constraining him to argue against his own settled convictions. All were therefore left alike free in their choice; hence it not infrequently happened that more than half a dozen followed in succession on the same side. After all the members who were disposed had concluded, the strangers or visitors present were invited to deliver their sentiments on the leading subject of the evening's discussion, or on any of the sentiments expressed by the different speakers in the course of it. It is scarcely necessary to add, that to this invitation it was ever felt a privilege to respond.

এমন কোনো বিষয় ছিল না যা-নিয়ে সভায় আলোচনা হত না। কেবল বিষয়ের নয়, আলোচনার স্বাচ্ছন্দ্য ও বিতর্কের রীতিরও এমন অভিনবত্ব ছিল যা তখনকার সভা-সমিতিতে তো বটেই, আজকালকার অতিআধুনিক বিদ্বৎসভাতেও সাধারণত দেখা যায় না। এই অভিনবত্বের জন্যই ডাফ সাহেবের বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্‌ধৃত করার প্রয়োজন হল। বিতর্কসভার প্রচলিত রীতি হল, আলোচ্য বিষয়বস্তুর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে যে-কেউ একজন সভার কাজ শুরু করেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ

একটা যান্ত্রিক রীতি, কারণ বক্তাদের মতামতটা এখানে গৌণ, তর্কের খাতিরে তর্কটা হল মুখ্য। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে এই গতানুগতিক রীতি বর্জন করে বক্তাদের ব্যক্তিগত মতামত অবাধে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হত। কারণ 'ইয়ং বেঙ্গলে'র এই সভার সমস্ত আলোচনার ও তর্কবিতর্কের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, প্রকৃত সত্য কি তাই অনুসন্ধান করা। সেইজন্য কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে হয়ত প্রথমেই একাধিক বক্তা তাঁদের বক্তব্য নিবেদন করতেন। এইভাবে অবাধে আলোচনা ও তর্ক চলত। মনে হত যেন কূলকিনারাহীন জ্ঞানসমুদ্রে, সত্যের অজানা দ্বীপে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে, একদল নাবিক একই জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে পথের নিশানা নিয়ে ব্যাকুল হয়ে আলাপ-আলোচনা করছে।

সভার সভ্যদের আলোচনা শেষ হবার পর আমন্ত্রিত ও উপস্থিত অতিথিদের আহ্বান করা হত প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের মতামত নিঃসংকোচে ব্যক্ত করার জন্য। এবং অতিথিরা, যতই জ্ঞানীগুণী ও প্রবীণ হন না কেন, এই আমন্ত্রণে সকলেই বিলক্ষণ উৎসাহিত হয়ে সাড়া দিতেন। তার কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনার মান এত উন্নত ছিল যে সভাটিকে তরুণ ছাত্রদের সভা বলেই মনে হত না। এই আলোচনার মান সম্বন্ধেও ডাফ সাহেব যা বলেছেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই উল্লেখ করতে হয়

> The sentiments delivered were fortified by oral quotations from English authors. If the subject was historical, Robertson and Gibbon were appealed to; if political, Adam Smith and Jeremy Bentham; if scientific, Newton and Davy; if religious, Hume and Thomas Paine; if metaphysical, Locke and Reid, Stewart and Brown. The whole was frequently interspersed and enlivened by passages cited from some of our most popular English poets, particularly Byron and Sir Walter Scott. And more than once were my ears greeted with the sound of Scotch rhymes from the poems of Robert Burns.

প্রত্যেক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সময় বক্তারা ইংরেজি সাহিত্য থেকে ভাল কথা অনর্গল আবৃত্তি করতেন। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টসন ও গিবন, রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মীয় বিষয় হলে হিউম ও টমাস পেইন, আধ্যাত্মিক বিষয় হলে লক, রীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন প্রমুখ মনীষীদের রচনা তরুণ তার্কিকরা নিজেদের উক্তির সমর্থনে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন। গুরুগম্ভীর বিষয় ও রচনার মধ্যে-মধ্যে হীরে-মুক্তার মতো তাঁরা ছড়িয়ে দিতেন তখনকার স্বনামধন্য ইংরেজ কবিদের উৎকৃষ্ট সব কবিতার পংক্তি, বিশেষ করে বাইরন ও ওয়াল্টার স্কটের। তার মধ্যে কতবার যে ডাফের (নিজে স্কচম্যান) কানে কবি রবার্ট বার্নসের স্কচ কবিতার ছন্দ ধ্বনিত হয়ে আসছে তার ঠিক নেই। জানি না, বর্তমান কালের শিক্ষক ও তরুণ ছাত্ররাও বোধহয় জানেন না, এরকম বিদ্বৎসভা আজকের কলকাতা শহরে আছে কি না, এবং যা আছে তার বিতর্কের মান তরুণ বক্তাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে ডাফের এই অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে কি না। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডাফ সাহেব ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের প্রতি, এমন কি হিন্দু-কলেজের প্রতিও, ধর্মশিক্ষা ও ধর্মভাবের অভাবের জন্য একেবারেই প্রীত ছিলেন না।

যে-কোনো একজন সভ্য উঠে সভায় একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করতেন। যেমন, ঈশ্বর আছেন কি নেই, জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, প্রতিমাপূজা বর্জনীয় কি না, যুক্তি বড না অন্ধবিশ্বাস বড়, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু না ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোকে ও তর্কে, অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা না বাধ্য সমষ্টিবশ্যতা, কোন্‌টা কাম্য? এইধরনের দার্শনিক সামাজিক সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক আর্থনীতিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা হত সভায়। ডাফের বর্ণনা শুনে বোঝা যায় যে সভাকক্ষ কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিসর্বস্ব কথার প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠত না, তরুণদের কঠোর সাধনালব্ধ জ্ঞান-বিদ্যার গম্ভীর প্রকাশবৈচিত্র্যেও থমথম করত। প্রবীণেরা অবাক হয়ে যেতেন, বিদেশী ইংরেজ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকতেন। দুইপক্ষই যুক্তির জাল বিস্তার করতেন, ঠিক বাদী-প্রতিবাদীর মতো নয়, কেবল বাদীর মতো বলা চলে। ন্যায়শাস্ত্রে যাকে 'ধাদ' বলে তারই অবতারণা করা হত সভায়।

রাজনৈতিক আলোচনা শুনে ইংরেজরা যে ভয় পেতেন না এমন কথা বলা যায় না। কারণ তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও ফিরিঙ্গি হলেও ভারতবর্ষকে স্বদেশ মনে করতেন। মনেপ্রাণে ডিরোজিও ছিলেন ভারতীয়। তাঁর তরুণ বয়সের লেখা অনেক কবিতায় এই স্বদেশপ্রেমের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কেবল 'জঙ্গিরার ফকির' কাব্যে নয়, ছোট-ছোট আরও অনেক কবিতায়। তার মধ্যে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডিরোজিওব প্রথম কাব্যসংকলনেব প্রথম কবিতা *The Harp of India* একটি চমৎকার নিদর্শন

Why hang'st thou lovely on your withered bough ?
Unstrung, for ever, must thou there remain ?
Thy music once was sweet who hears it now ?
Why doth the breeze sigh over thee in vain ?
Silence hath bound thee with her fatal chain ;
Neglected, mute, and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain :—
..........but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

আঠার বছরের তরুণ কবির স্বদেশ সম্বন্ধে এই কল্পনা, বেদনাবোধ এমনিতেই প্রশংসনীয়, তার উপর ডিরোজিও কেবল বয়সে তরুণ নন, পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারের সন্তান বলে এই ভারতবেদনাবোধ আরও বিস্ময়কর। 'হে আমার স্বদেশী বীণা! তোমার ঐ বেসুরো ছেঁড়া তারে আবার আমায় সুর বাঁধতে দাও।'

ভারত-বীণার ছেঁড়া তারে ডিরোজিও নিজেই যে কেবল সুব বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনের অগ্নিবীণাতেও সেই সুরেব ঝংকার তুলেছিলেন। অ্যাকাডেমিকেব আলোচনাসভায় মধ্যে-মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সম্বন্ধেও তর্ক হত। 'Young Lions of Bengal' কেবল সামাজিক কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে নয়, বিদেশীর দাসত্বের বিরুদ্ধেও ঘন-ঘন গর্জন করে উঠতেন। 'পার্থিনন' নামে সভার একটি মুখপত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। এই 'পার্থিনন' বোধহয় বাঙালীদের দ্বারা

প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা (১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) থেকে জানা যায় যে 'পার্থিনন' দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দুধর্ম, গবর্নমেণ্টের বিচারবিভাগের ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদির আলোচনা ও সমালোচনা। দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয়নি। প্রথম সংখ্যা দেখেই গোঁড়া হিন্দুরা এতদূর শংকিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয় সংখ্যা 'মুদ্রাঙ্কিত' হলেও তাঁরা 'গ্রাহকদিগেব নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই।' পত্রিকা বন্ধ হলেও 'যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই।'

অ্যাকাডেমিকের আলোচনার ভিতর দিয়ে সত্যের দুর্গম দ্বীপে তরুণ বাংলার দুঃসাহসিক অভিযান চলতে থাকল অনিরুদ্ধ গতিতে। বাংলার এই তরুণ অভিযাত্রিকদের নাবিক হলেন ডিরোজিও।

ডিরোজিও যে কেবল অ্যাকাডেমিকেই বক্তৃতা দিতেন তা নয়, মধ্যে-মধ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিতে যেতেন। হেয়ার সাহেব তাঁর পটলডাঙ্গার স্কুলে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। হিন্দুকলেজের বাইরে কলকাতার তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ধীরে-ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল। এ-প্রভাব বন্ধনহীন স্বাধীনচিন্তার প্রভাব, বাংলার দীপ্ত তারুণ্যের কাছে যার আবেদন গভীর। এই আবেদনে তরুণদের মনে সাড়া জাগছিল এবং হিন্দুসমাজও আতংকিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু এত আতংকের কারণ কি?

'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নবযুগের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রথম প্রবর্তক বলে আলোড়ন এত ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল। রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'আত্মীয় সভা'র বৈঠকে যে নিয়মিত আলোচনা হত সে-কথা আগে উল্লেখ করেছি। ১৮১৯, ১৮মে 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকা সভার বিবরণ প্রসঙ্গে লেখেন

> At the meeting in question, it is said. the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions

> on diet, etc. was freely discussed, and generally admitted—the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy—the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned as well as all superstitious ceremonies in use amongst idolaters....
>
> *The Calcutta Journal*, No. 87, May 18, 1819.

যদিও 'freely discussed' কথাটি এখানে আছে, তাহলেও 'আত্মীয় সভা'র আলোচনায় বাইরের সমাজে সেরকম কোলাহলের সৃষ্টি হয়নি কেন? কেন হিন্দুসমাজের মনে তেমন ভীতির শিহরণ জাগেনি? তার কারণ ১৮১৫-২০ থেকে ১৮২৫-৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কালের ব্যবধান মাত্র দশ-পনের বছরের হলেও সামাজিক পরিবেশের ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল অনেক বশি। কালের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে চলেনি সামাজিক পরিবর্তনের স্রোত।

মানুষের জীবনের মতো সমাজের জীবনেরও বিভিন্ন যুগের ও পর্বের গতিবেগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকে। জীবনের পর্বে-পর্বে বাল্যে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেমন চলার গতি ও ছন্দ বদলায়, তেমনি যুগ থেকে যুগান্তরে, এবং একই যুগের ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে সমাজের পরিবর্তনের গতি ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ধারা বদলায়। সামাজিক গতিবিজ্ঞানের (Social dynamics) এটা একটা মূলসূত্র বলা চলে। ডিরোজীয়ানদের কালে ঘটনাস্রোত অনেক দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়েছিল এবং তার ফলে পুরাতন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' এবং ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক সভা', এই দুয়ের সামাজিক গড়ন (Social composition) লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। 'আত্মীয় সভায়' ছিল বিত্তের দিক থেকে ধনিক এবং বয়সের দিক থেকে মধ্যবয়সীদের প্রাধান্য। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীর মধ্যে সকলেই প্রায় ধনিক ও প্রৌঢ় ছিলেন। ডিরোজিওর যুগে সমাজের আকারে বেশ একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটল। সর্বপ্রথম বাংলা দেশে নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত একদল মধ্যবিত্ত যুবকের আবির্ভাব হল সমাজে। নবযুগের বাংলার এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই মধ্যবিত্ত তরুণদলের নায়ক হলেন যিনি,

বয়সে তিনিও তরুণ। এ-ও একটা ইতিহাসের অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ। বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণদলের চিন্তানায়করূপে প্রায় সমবয়স্ক তরুণ ডিরোজিওর আবির্ভাবে স্বভাবতঃই তাই আমাদের দেশে যুগসম্মত একটা চিন্তাবিপ্লবের সূচনা হল।

শিক্ষার দিক থেকে পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত, সামাজিক শ্রেণীর দিক থেকে মধ্যবিত্ত এবং বয়সের দিক থেকে তরুণ—এই তিনটি ঘটনার সংযোগ উনিশ শতকের বাংলার সমাজের প্রথম জাগরণকালে যে কতদূর বিস্ফোরক বৈপ্লবিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। ডিরো-জীয়ানদের যুগে ঠিক এই পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছিল। রামমোহনের যুগের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবয়স্কের জড়তা ও মন্থরতা তরুণ ডিরোজীয়ানদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই ঐতিহাসিক অগ্রগামিতার সঙ্গে ডিরোজিও তখন নবীন তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্তি মিলিত করতে পেরেছিলেন বলে সেযুগের জাদুকর হয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনচিন্তার উচ্চশব্দে ও প্রাণচাঞ্চল্যের তরঙ্গাঘাতে সমাজের জীর্ণ পুরাতন বাঁধগুলি কাঁপতে আরম্ভ করেছিল।

কোনো উদ্দাম নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গভঙ্গের দৃশ্য দেখলে সামাজিক ঘটনাবর্তের স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়। তরঙ্গকে আঘাত করে তরঙ্গ, তরঙ্গমালা ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, আরও বৃহত্তর তরঙ্গ উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। সমাজেও ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক এইরকম অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত। প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়কে আঘাত করে এবং তৃতীয়কে ভেঙে আত্মসাৎ করে পরবর্তী ঘটনাকে দূরপ্রসারী করে তোলে। ডিরোজিওর জীবনের ট্রাজিডি হল, ১৮২৯-৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এইরকম একসূত্রে গাঁথা কয়েকটি বড়-বড় ঘটনার সম্মিলিত আবর্ত। এগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি এবং তার প্রচণ্ড ঝাপটা সমাজের সর্বকোণ থেকে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে যৌবনের মধ্যাহ্নেই তাঁর জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর। মাত্র দু'বছর। এই দু'বছরের মধ্যে ডিরোজিওর জীবননাট্যের অকস্মাৎ যবনিকা-পাত হল।

৫. ঈশানের মেঘ

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তরুণ সিংহশিশুরা যখন শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় সামাজিক মিথ্যাচার অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানিকতলায় 'অ্যাকাডেমিক সভার' গুহাভ্যন্তর থেকে তর্জন-গর্জন করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখনও নবযুগের অধিনায়ক রামমোহন রায় পূর্ণগৌরবে কলকাতার সামাজিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যদের কার্যকলাপ ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তাঁর মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা তিনি ব্যক্ত করেননি। এমন সময় ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর অনেক টালবাহানা করে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তার ফলে রক্ষণশীল বিরাট হিন্দুসমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভে সমাজের পাঁজর পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলেন। সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ-আন্দোলন করার জন্য তাঁরা ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন। প্রতিক্রিয়ার সুসংহতরূপের এই প্রথম প্রকাশ হয় সমাজে। 'ধর্ম গেল,

জাত গেল' কলরবে মুখর হয়ে ওঠে সমাজ, ধর্মধ্বজীদের চিৎকারে কলকাতার আকাশ ফাটবার উপক্রম হয়। তাঁদের সমস্ত আক্রোশ হিন্দুকলেজের নব্য-শিক্ষিত তরুণদের লক্ষ্য করে ধাবিত হতে থাকে। স্বাধীনচিন্তা ও পাশ্চাত্য-বিদ্যা যে সমস্ত অনর্থের মূল, এ-ধারণাও তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এমন সময় ১৮৩০, ২৭ মে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌছলেন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আসার মাস-দুয়ের মধ্যে তিনি রামমোহনের সহযোগিতায় ১৮৩০, ১৩ জুলাই 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য লালবিহারী দে'র ভাষায় ডাফের এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই হল 'foundation of Christian education in India.' জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে ডাফ সাহেবের স্কুল খোলা হল, যে-বাড়িতে প্রথমে হিন্দুকলেজ এবং রামমোহনের ব্রহ্মসভা স্থাপিত হয়েছিল। ডাফ দেখলেন, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের চমৎকার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কলকাতায়, কারণ ইংরেজিশিক্ষিত বাংলার তরুণরা স্বাধীন-চিন্তা ও যুক্তির উপর নির্ভর করতে শিখেছেন। কিন্তু হিন্দুকলেজ হল ডাফের ভাষায় 'The very *beau-ideal* of a system of education without religion'—সুতরাং প্রথমে তিনি ধর্মভিত্তিক শিক্ষার অভাব পূরণ করলেন নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সামনে ধর্মের খোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে তাঁর কামনার বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। অশিক্ষিত ও অনগ্রসরদের মধ্যে আর ধর্মপ্রচারকার্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে না ভেবে মনে-মনে উল্লসিত হলেন। শহরের শিক্ষিত যুক্তিবাদী তরুণদের কাছে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানের সম্ভাবনা বিপুল। এই আশায় উদ্ভাসিত হয়ে তিনি লিখেছেন, 'We hailed the circumstance as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed.' সেই প্রতীক্ষা, বাসনা ও প্রার্থনা বহুদিন পরে পূর্ণ হবার সুযোগ এল। ধর্মপ্রাণ ডাফ আর বিলম্ব না করে খ্রীস্টধর্মবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। হিন্দুকলেজের কাছে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন তার একতলার হলঘরে বক্তৃতা হবে ঠিক হল, একটি বক্তৃতা নয়, বক্তৃতামালা। শ্রোতারা বক্তাকে যেরকম খুশি প্রশ্ন করতে পারবেন এবং বক্তৃতার পরে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হতেও বাধা নেই। বুদ্ধিমান ডাফ কেন যে এই বক্তৃতার

আয়োজন করেছিলেন তা তাঁর স্থানকাল নির্বাচন ও শ্রোতাদের বিতর্কের সুযোগ দানের সংকল্প থেকে বোঝা যায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্ররা, বিশেষ করে অবাধচিন্তার অগ্রদূত ডিরোজিওর শিষ্যরা। ডাফ জানতেন, এই সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের মনে কোনো বিশেষ ধর্মগোঁড়ামি নেই। উর্বর মানসক্ষেত্র তাদের নির্মল যুক্তির রৌদ্রস্পর্শে কর্ষণের প্রত্যাশা করছে। তারই আকর্ষণে পাদ্রি ডাফ দিশাহারা হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, তরুণদের মনের সেই সোনার ক্ষেতে যদি খ্রীস্টধর্মের বীজ সযত্নে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে ফসলের ভাবনা আর ভাবতে হবে না, আশ্চর্য ফসল ফলবে সেখানে। তা-ছাড়া তাঁর মনে হল, অশিক্ষিত ও অনুন্নত জাতির লোকজনকে দলে-দলে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে কলকাতা শহরের একজন সদ্‌বংশের সুশিক্ষিত তরুণকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিতে পারলে শতগুণ সুফল ফলবে। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও জড়ত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙতেও তা অনেক বেশি সাহায্য করবে।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ডাফ তাঁর সংকল্পসাধনের পথে অগ্রসর হলেন। প্রথম বক্তৃতা দিলেন পাদ্রি হিল সাহেব। ভয়ংকর গরম বক্তৃতা। যেমন আবেগের উগ্রতা, তেমনি যুক্তির তীক্ষ্ণতা। ভূমিকম্পে মেদিনী কেঁপে ওঠার মতো তাঁর বক্তৃতায় কলকাতার হিন্দুসমাজের অন্তর কেঁপে উঠল। ডাফ সাহেবের নিজের ভাষায় 'The whole town was literally in an uproar.' লালবিহারী দে লিখেছেন, 'That lecture fell like a bombshell among the College authorities.' *India and India Missions* গ্রন্থে ডাফ নিজে এই বক্তৃতার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তার মর্ম এই: 'বক্তৃতার সঙ্গে-সঙ্গে সারা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা গুজব দুরন্তবেগে রটতে আরম্ভ করল এবং রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল শহরে। বাস্তবিক সেই বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ যাঁরা না স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা করে বুঝিয়ে বলা তা সম্ভব নয়। বক্তৃতার পর হিন্দুদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হল এই যে, আমরা খ্রীস্টান পাদ্রিরা যে-কোনো প্রকারে হোক, ভয় বা লোভ দেখিয়ে এদেশের হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করার সংকল্প করেছি। শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা আমাদের হীন চক্রান্তের কথা

জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। পাদ্রিদের কবল থেকে কি উপায়ে তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে উত্তেজিত আলোচনা চলতে থাকল। হিন্দুকলেজেব ছাত্রদেব অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে কর্তৃপক্ষেব কাছে অভিযোগ কবলেন এই বলে যে কলেজের ধর্মনীতি-হীন বিজাতীয় শিক্ষাব ফলেই যুবকদেব নৈতিক চবিত্রের স্খলন হচ্ছে। প্রতিদিন এই ধবনের অভিযোগ এসে জমতে থাকল কলেজে। পরিচালকরা রীতিমত ভীত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে কমিটিব জরুরি বৈঠক ডেকে এই মর্মে তাঁবা এক প্রস্তাব পাস কবলেন যে কলেজেব ছাত্রদেব অসংযত আচরণে অধ্যক্ষ ও অভিভাবকবা সকলেই অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন এবং সেইজন্য ধর্মবিষয়েব কোনো আলোচনাসভায় বা বক্তৃতায় ছাত্রদের যোগ দিতে তাঁবা নিষেধ কবছেন।'

পবিষ্কাব বোঝা যায়, পাদ্রি হিলের বক্তৃতাটি কামানেব গোলার মতো ফেটে পড়েছিল হিন্দুসমাজের মাথাব উপব, এবং তাব সমস্ত আঘাতটা সহ্য করতে হয়েছিল এই কলেজকে। অভিভাবকবা ভীত হয়ে ছেলেদেব কলেজ ছাড়তে বাধ্য করছিলেন। জনৈক 'হিন্দুকালেজছাত্রস্য পিতুঃ' লিখেছেন, "প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহারা স্থানে-স্থানে সভা কবিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও বাজনিয়মের বিবেচনা করে এইসকল দেখিয়া পুত্রেব কলেজে যাওয়া রহিতকবণেব চেষ্টা কবিলাম।" 'ছাত্রস্য পিতুঃ' যে-সভাব কথা এখানে উল্লেখ কবেছেন তা, স্পষ্টই বোঝা যায়, ডিরোজীয়ানদের অ্যাকাডেমিক সভা। কলেজে যাওয়া, 'রহিতকবণের' চেষ্টা কবেও সকল পিতা সফল হননি, কারণ ছেলেরা কেউ সহজে কলেজ ছাড়তে চায়নি। তাহলেও কলেজেব ছাত্রসংখ্যা ১৮২৯ থেকে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে বেশ দ্রুতহারে কমে গিয়েছিল। এই সংখ্যাহ্রাসেব কারণ 'a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys' বলে কের (J. Kerr) সাহেব পবিষ্কাব ইঙ্গিত কবেছেন।

একদিকে বেন্টিঙ্কেব সতীদাহ-নিবাবণ আইন, আর একদিকে ডাফ-হিল প্রমুখ অত্যুৎসাহী পাদ্রিদের খ্রীস্টধর্মাভিযান, এই দুই আঘাতের প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিঘাত হিন্দুকলেজকেও তার একজন শিক্ষককে সহ্য করতে হল।

হিন্দুদের সমস্ত আক্রোশ ধূমায়িত হতে থাকল ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে। ডিরোজিওর একটি অপরাধ নয়, অনেক অপরাধ। প্রথম অপরাধ, তিনি বয়সে তরুণ, অতএব তরুণ ছাত্রদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া ও ক্ষেপিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষা দেন না। প্রাণহীন যন্ত্রের মতো দিনের পর দিন পাঠ বলে দিয়ে চর্বিতচর্বণ করাতে পারলে শিক্ষকতার যে গুরুদায়িত্ব স্বচ্ছন্দে পালন করা যায়, তা না করে ডিরোজিও অবাধ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও তর্কবিতর্কের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের নিজস্ব মতামত ও যুক্তি প্রকাশের ক্ষমতা জাগিয়ে তুলে অনর্থক তার অপব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তরুণরা স্বাধীনচিন্তার মর্যাদা রক্ষা করতে না পেরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অপরাধ, শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর নিজের মতামত আপত্তিকর, কারণ তা গতানুগতিক বিশ্বাস ও প্রচলিত ধ্যানধারণার বিপরীত। তাঁর মতে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগম্য নয়, তা বেদ-কোরাণ-বাইবেলের আপ্তবচন হলেও গ্রাহ্য ও বিবেচ্য নয়। শিক্ষক নিজে যদি এতদূর বিদ্রোহী হন এবং বয়সেও তরুণ হন, তাহলে তাঁর তরুণ ছাত্ররা স্বাধীনতা মনে করে স্বেচ্ছা-চারিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে? অতএব সমস্ত অপরাধ ডিরোজিওর।

এর মধ্যে আরএকটি ব্যাপারে হিন্দুরা আরও বেশি উত্তেজিত হলেন। ডাফ সাহেব লিখেছেন, হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষরা ছাত্রদের সভা-সমিতিতে যোগদান করা নিষেধ করে যে আদেশ জারী করেছিলেন তা 'presump-tuous', 'tyrannical', 'absurd and ridiculous' ইত্যাদি বলে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় নিন্দিত হয়েছিল। ডাফ অবশ্য কোনো বিশেষ পত্রিকাব নাম উল্লেখ করেননি। মনেহয় এইসব পত্রিকার মধ্যে নির্মম সমালোচনা করা হয়েছিল *India Gazette* পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গ্র্যান্ট সাহেব, ডিরোজিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডিরোজিও নিজে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করতেন। বাইরের শিক্ষিত পাঠকবর্গ এবং হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষদের একথা অজানা ছিল না। তাই পত্রিকার সমালোচনা সম্বন্ধে গুজব রটে গেল যে ডিরোজিওই তার লেখক। কেউ-কেউ লেখার স্টাইল দেখেও সে-কথা বলতে

লাগলেন। রচনার নমুনা এই

> We regret much to see the names of such men as David Hare and Rassomoy Dutt attached to a document which presents an example of presumptuous, tyrannical and absurd intermeddling with the right of private judgement on political and religious questions. The interference is presumptuous for the Managers as Managers have no right whatever to dictate to the students of the Institution, how they shall dispose of their time out of College. It is tyrannical, for although they have not the right, they have the power, if they will bear the consequences to inflict their serious displeasure on the disobedient. It is absurd and ridiculous, for if the students know their rights and had the spirit to claim them, the Managers would not venture to enforce their own order, and it would fall to the ground, an abortion of intolerance.

কলেজের অধ্যক্ষদের এই রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকা ডাফ সাহেবকে খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন এবং কলেজের ছাত্রদেরও নির্দেশ দেন, নির্ভয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাদ্রিদের সভায় যোগদান করতে। ডিরোজিও লিখুন আর গ্র্যাণ্টই লিখুন, এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবে ও ভাষায় বিলক্ষণ সংযমের অভাব ঘটেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে ভাবের উচ্ছ্বাস ও ভাষার খানিকটা অসংযম থেকে মনে হয় প্রবন্ধের লেখক ডিরোজিও নিজে। তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবীণদের চক্রান্তে মনে হয় যেন তরুণ গুরুর আত্মাভিমানের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তাই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি হয়েছে কোনো গোপন বিপ্লবীচক্রের উত্তপ্ত ইশ্‌তেহার।

এর পরেও যদি ঝড় না-ওঠে, তাহলে এতদিন ধরে তরুণদের মাথার উপর স্তরে-স্তরে যে মেঘ জমল তার মুক্তি হবে কি করে?

৬. ঝড়

অবশেষে ঝড় উঠল।

শনিবার, ২৩ এপ্রিল ১৮৩১।

হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষরা জরুরী সভায় মিলিত হলেন। গবর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর, সহকারী সভাপতি উইলসন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

গম্ভীর নিস্তব্ধ পরিবেশ। সভার আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করে সম্পাদক বললেন: 'অধ্যক্ষদের এই জরুরী সভা আহ্বান করার কারণ হল, বিদ্যালয়ে কোনো একজন শিক্ষকের অপ্রত্যাশিত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শংকার সঞ্চার হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানেরও অনিষ্ট হচ্ছে। এই শিক্ষকটির উপর অনেক তরুণের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁর বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ

হচ্ছে এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমেই পরিবার ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে। এই ঘটনার কথা সকলেই জানেন, সুতরাং এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে এই ঘটনা সম্বন্ধে বাইরে যে আপত্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রায় পঁচিশজন ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র অসুখের অজুহাতে কলেজে আসা বন্ধ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই কলেজ ছেড়ে দেবে মনে হয়। বিষয়টি নিয়ে কিছুকাল ধরে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। অভিভাবকদের চিঠিপত্র ও অধ্যক্ষদের মতামত থেকে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত তা ক্রমান্বয়ে প্রস্তাবাকারে এই সভায় পেশ করা হবে।'

সভা শুরু হবার আগে উদ্দেশ্যটি এইভাবে ব্যক্ত করা হয়। পরিবেশ ক্রমেই আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই প্রস্তাবনার মধ্যে যে-শিক্ষকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তা বলাই বাহুল্য। প্রস্তাবগুলি এই

১ ডিরোজিও যেহেতু সমস্ত অনর্থের মূল এবং জনসাধারণের আতংকের কারণ হয়ে উঠেছেন, সেইজন্য তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করা সঙ্গত এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগও অবিলম্বে ছিন্ন করা আবশ্যক।

২. উচ্চশ্রেণীর যে-সব ছাত্রের আচার-ব্যবহার ও অভ্যাস আপত্তিকর বলে অভিযোগ এসেছে এবং যারা ভোজসভায় যোগদান করেছে, তাদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হবে।

৩. যে-সব ছাত্র প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মবিরোধী আচরণ করে এবং এদেশের সামাজিক প্রথা অমান্য করে চলে, তাদেরও কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক।

৪ কলেজে ভর্তি হবার বয়স ১০ থেকে ১২ এবং ১৮ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত করা হবে।

৫. মৌখিক শাসনে বা তিরস্কারে যদি ভাল ফল না পাওয়া যায় তাহলে অবাধ্য ছাত্রদের দৈহিক দণ্ডদানেরও ক্ষমতা দিতে হবে প্রধান শিক্ষককে।

৬. ছেলেদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে খোঁজখবর না করে কলেজে ভর্তি করা হবে না।

৭. ইওরোপীয়দের পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে তাঁদেরই বেশি সুযোগ দিতে হবে, অবশ্য তাঁদেরও চরিত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে।*

৯. বিদ্যালযের ছুটি হবার পর ছাত্রদের কলেজ-এলাকার মধ্যে থাকতে দেওয়া হবে না।

১০. যদি কোনো ছাত্র বাইরের কোনো সভা-সমিতিতে বা বক্তৃতায় যোগদান করে তাহলে তাকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

১১. কি-কি বই পাঠ্য হবে এবং কতক্ষণ তা পড়ানো হবে, তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

১২. ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হতে পারে এমন কোনো বই কলেজে কেনা, পড়ানো বা পড়তে দেওয়া হবে না।

১৩. ফার্সী ও বাংলা পড়ার জন্য ছাত্রদের আরও বেশি সময় দিতে হবে।

১৪. সিনিয়ব ক্লাসের ছাত্রদের সংস্কৃত পড়তে হবে।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সাত-নম্বর প্রস্তাবটি পরিষ্কার নয়। 'ইওরোপীয়' কি? ছাত্র না শিক্ষক? আলোচনার সময় প্রস্তাবটি পুনরায় রচনা করে 'qualified European teachers' বলে গৃহীত হয়েছে। ডিরোজিওর তরুণ শিষ্য হিন্দুকলেজের ছাত্রদের কীর্তিকলাপে হিন্দুসমাজে যে কি গভীর আলোড়ন হয়েছিল তা আলোচ্য প্রস্তাবগুলির ভাব ও ভাষা দেখে বোঝা যায়। ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা নয় শুধু, নিয়মের শৃঙ্খলে ছাত্রদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবারও সংকল্প করেছিলেন কলেজের অধ্যক্ষরা। শিক্ষক ডিরোজিওর সঙ্গে হিন্দুধর্মপ্রথাবিরোধী স্বাধীনচেতা সিনিয়র ছাত্রদেরও অনেককে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৃতীয় প্রস্তাবটি কেবল এই মর্মে সংশোধন করা হয়েছিল যে অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হবে, তাঁরা যদি মনে করেন যে কলেজের জন্য ছাত্রদের আচরণ হিন্দুধর্মবিরোধী হয়ে উঠছে, তাহলে যখন খুশি তাঁদের ছেলেদের তাঁরা ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। চতুর্থ

* ৮ নং প্রস্তাবটি কলেজ রেকর্ডে নেই।

প্রস্তাব অনাবশ্যকবোধে বাতিল করা হয়েছে। দৈহিক দণ্ডদানের ও ছেলেদের নৈতিক চরিত্র অনুসন্ধানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। দশম প্রস্তাব সম্বন্ধে অধ্যক্ষরা সিদ্ধান্ত করেন যে কলেজের বাইরে ছেলেরা কোনো সভা-সমিতিতে বা বক্তৃতায় যোগদান করবে কি-না সে-বিষয়ে তাদের আত্মীয়স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা ভেবে দেখবেন, কলেজ-কমিটির এ-বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব নেই।

প্রথম প্রস্তাব ডিরোজিওর পদচ্যুতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের মধ্যে বেশ আলোচনা ও মতান্তর হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করার সময় বলা হয়

> Whether the Managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be entrusted with the education of youth.

ডিরোজিওর নীতি ও ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদীক্ষার ফলে ছাত্রদের যে মনোভাবের বিকাশ হয়েছে তা দেখে কলেজের অধ্যক্ষরা তাঁকে তরুণদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের একজন অযোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেন কি-না? প্রস্তাবটি এইভাবে ঘুরিয়ে পেশ করা হয়েছিল বোধ হয় আলোচনার সুবিধার জন্য।

কলেজের গবর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর বলেন যে হাতে যে-সব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ডিরোজিও একজন অযোগ্য শিক্ষক।

সহকারী সভাপতি উইলসন বলেন যে ডিরোজিওর শিক্ষার কোনো কুফলের প্রমাণ তিনি অন্তত পাননি এবং তাঁকে একজন সুযোগ্য ও ক্ষমতাশালী শিক্ষক বলেই তিনি মনে করেন।

রাধাকান্ত দেব বলেন যে তরুণদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ডিরোজিওকে

একজন অত্যন্ত অযোগ্য শিক্ষক বলে মনে করেন।

রসময় দত্ত বলেন যে এখানকার রিপোর্ট দেখার আগে তিনি ডিরোজিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের কথা কিছু জানতেন না।

পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় বলে ডিরোজিওর চরিত্র ও শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্মত হন না।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডিরোজিও যে একজন অযোগ্য শিক্ষক সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

রাধাকান্ত দেবের অভিমত সমর্থন করে রামকমল সেন বলেন যে ডিরোজিও তরুণদের যোগ্য শিক্ষক নন।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়, তাঁর সম্বন্ধে যোগ্যতা বিচারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ডেভিড হেয়ার বলেন যে ডিরোজিওর মতো সুযোগ্য শিক্ষক বর্তমানে দুর্লভ এবং তাঁর সুশিক্ষার ফলে ছাত্ররা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

ন'জনের মধ্যে ছ'জন অধ্যক্ষ ডিরোজিওর সপক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। যেভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয় তা স্বভাবতঃই ভোটে বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। অতএব ডিরোজিও-বিমুখ অধ্যক্ষদের নির্দেশেই মনে হয়, প্রস্তাবটি অন্যভাবে পুনবায় পেশ করা হয়। নতুন প্রস্তাবটি এই

Whether it was expedient in the present state of

Public feeling amongst the Hindoo community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

নবরূপের এই প্রস্তাবটি কতকটা দুমুখো করাতের মতো, যেদিক দিয়েই চালিত হোক না কেন, এবারে ডিরোজিওর শিরশ্ছেদ হতে বাধ্য, তাঁর নিস্তার নেই। যোগ্যতা অযোগ্যতা, শিক্ষার সুফল-কুফল, ছাত্রদের নৈতিক উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি তর্কসাপেক্ষ প্রশ্ন একেবারে চাপা দিয়ে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানের সমস্যাটি এমন কৌশলে তুলে ধরা হল অধ্যক্ষসভার সামনে যে তাঁরা প্রত্যেকেই উভয়সংকটে পড়ে গেলেন। সমস্যাটা দাঁড়াল এই, ব্যক্তির স্বার্থ, না সমষ্টির বা সমাজের স্বার্থ, কোনটা বড় ?

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ যদি সত্য না-ও হয়, তাতে কি আসে যায় ? সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, কলকাতা শহরের সমগ্র হিন্দু সমাজের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যখন যে তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল এবং তরুণ ছাত্রদের যাবতীয় অনাচার ব্যভিচারের প্রধান উৎসাহদাতা, তখন সেই ধারণার সত্যতা বিচার না করে তার বেদীমূলে তাঁকে উৎসর্গ করাই নিরাপদ নয় কি ? জনসমাজের এই অপমানিত ও ব্যথিত চিত্তের দিকে ডিরোজিওর পদচ্যুতি 'expedient' বা সমীচীন কি-না বিচার করে দেখা অধ্যক্ষদের কর্তব্য।

রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবার গবর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর যোগদান করে বললেন যে ডিরোজিওর পদচ্যুতি 'necessary' বা প্রয়োজনীয়। রসময় দত্ত ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর বললেন, 'expedient' বা অবস্থাগতিকে আবশ্যক। উইলসন ও ডেভিড হেয়ার কেউ কোনো মত প্রকাশ করলেন না, হিন্দুসমাজের ব্যাপার বলে। সুতরাং প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হল এই মর্মে যে, ডিরোজিওর পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হোক, তাঁর কর্মক্ষমতার ন্যায্য স্বীকৃতি দিয়ে—

Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect with due consideration for his merits and services.

কলেজের অধ্যক্ষরা ডিরোজিওকে সোজাসুজি পদচ্যুত করেননি। উইলসন একখানি চিঠিতে ডিরোজিওকে সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে তাঁকে স্বেচ্ছায়

পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন। পদত্যাগপত্রসহ ডিরোজিও পত্রোত্তরে উইলসনকে যা লেখেন তার মর্ম এই

'মহাশয়,—আপনার নির্দেশ মতো এই চিঠির সঙ্গে পদত্যাগপত্র পাঠালাম। পত্রখানি পাঠ করলেই দেখতে পাবেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ আমি যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার শিক্ষকতাকালে কলেজের কোনো অনিষ্ট হয়েছে বলে যদি আমি মনে করতাম, অথবা তার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ থাকত, তাহলে আমার দিক থেকে বিনা প্রতিবাদে পদত্যাগ করার যুক্তি অবশ্যই আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এতখানি আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে একটা সাময়িক ঘটনা-বর্তের আঘাত সহ্য করা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি না। একথা আমি কি করে অস্বীকার করব যে আপনারা আমাকে বাধ্য করছেন পদত্যাগ করতে। নির্বিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠানো তাই কোনো মতেই সম্ভব হল না। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি, আমার সম্মানরক্ষার জন্য আপনি যে এই অনুরোধ করেছেন তা আমি জানি। কিন্তু সেই সান্ত্বনায় আমার অপমানের বেদনার উপশম হচ্ছে কোথায়? প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি পদচ্যুত করে আমাকে অপমান করাই সাব্যস্ত করেন, তাহলে আমারও সে অপমান সহ্য করার মতো শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

কলেজের কয়েকজন হিন্দু কর্মাধ্যক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে অসংযত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তা সহজে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। অতএব কলেজে পুনরায় শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করার সম্ভাবনা আপাতত দেখছি না। তাছাড়া, কর্মজীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ তীরে গিয়ে জীবনতরী ভিড়বে তার ঠিক নেই। হয়ত জীবনে আর আপনার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হবে না। আজ তাই এই সুযোগে আপনার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কলেজে কাজ করার সময় আপনার কাছ থেকে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি তা জীবনে কখনও ভুলব না।—ইতি

এইচ. এল. ভি ডিরোজিও'

এই চিঠির সঙ্গে যে পদত্যাগপত্রটি ডিরোজিও পাঠিয়েছিলেন তার মর্ম এই

ম্যানেজিং কমিটি, হিন্দুকলেজ

'ভদ্রমহোদয়গণ,—গত শনিবারের জরুরী বৈঠকে আপনারা কলেজের

সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ উচিত মনে করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার জন্য আমি এই পদত্যাগপত্র পেশ করতে বাধ্য হচ্ছি।

সভার কার্যবিবরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি এ-রকম কয়েকটি বিষয়ের প্রতি প্রসঙ্গত এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ চেষ্টা করেও আপনারা প্রমাণ করতে পারেননি। যে-সব অভিযোগ করা হয়েছে তা এখনও আমি জানি না, এবং আমাকে জানানোর প্রয়োজনও আপনারা বোধ করেননি। অভিযোগকারীদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার জবাব দেবার ন্যায্য অধিকার থেকেও আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত চরিত্র, অভিরুচি, আদর্শ, নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনা করেছেন আপনারা, আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে। এ-কথাও আমি জানি যে কমিটির অধিকাংশ সভ্য আমার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অপবাদ স্বীকার না করা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে যে-কোনো অজুহাতে শিক্ষকপদ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। অপরাধী যে তাকে জেরা করা হল না, সে জানল না তার অপরাধ কি, অথচ তার একতরফা বিচার ও দণ্ডদান দুই-ই শেষ হয়ে গেল। আশা করি, এগুলি সত্য বলে স্বীকার করতে আপনারা সংকোচবোধ করবেন না। তাহলেই আমি খুশি হব, আর কোনো মন্তব্য করব না।'

পদত্যাগপত্রের শেষে উইলসন, ডেভিড হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে ডিরোজিও আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁদের সৎসাহসের জন্য।

ডিরোজিওর চিঠির উত্তরে উইলসন পরে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলির আভাস পাওয়া যায়। উইলসন লেখেন

'প্রিয় ডিরোজিও,

মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু তবু কলেজের হিন্দু ম্যানেজারদের সম্পর্কে অতটা রূঢ় মন্তব্য না করলেই পারতেন। বাস্তবিক তাঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। সমাজের প্রতিক্রিয়ার কাছে তাঁরা খানিকটা অবস্থাগতিকে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত বা ন্যায়সঙ্গত বিচার-বিবেচনা করার অবকাশ তাঁরা পাননি। আপনার ব্যক্তিগত নিন্দা ও বিরূপ

সমালোচনাও সভায় তেমন কিছু করা হয়নি। কলকাতার লোকের, বিশেষ করে হিন্দুসমাজের মনে, আপনার সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যা কলেজের পক্ষে সত্যি ক্ষতিকর হচ্ছে। সেই ধারণাটা সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার জন্য তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে অথবা সাক্ষীসাবুদ ডেকে জেরা করে বিশেষ কোনো লাভ হত না। এখনও অন্তত ঘরোয়াভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে বলে আমার ধারণা। কিছুদিন তা চলবে বলে মনে হয়।

আপনার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সেগুলি কি তা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমি প্রশ্নাকারে জানাচ্ছি। প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আপত্তি না থাকলে দেবেন।

আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ?

আপনি কি মনে করেন যে পিতামাতার আদেশ পালন করা অথবা তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয় ?

আপনার মতে ভাইবোনের বিবাহ কি সামাজিক অপরাধ নয় ?

এইসব বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আপনি কি স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা করেন ?

আমি জানি, এ-সব কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার আমার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তবু আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের অসন্তোষের কারণ কি, এবং জনসাধারণের মধ্যে কি ধরনের গুজব রটনা হয়েছে, তারই একটু আভাস দেবার জন্য এগুলি লিখে জানালাম। এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন তা সাহস করে বলতে পারলে আমি নিজে খুবই খুশি হতাম। আপনার কোনো যুক্তিপূর্ণ জবাব পেলেও আমি তা অধ্যক্ষদের দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

নিবেদন ইতি,

এইচ. এইচ. উইলসন।'

উইলসনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন ডিরোজিও, সেটি তাঁর জীবনের মহার্ঘ্য দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। চিঠিখানি দীর্ঘ, কিন্তু এই দলিল-মূল্যের জন্য তা সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃতির প্রয়োজন।

এইচ. এইচ. উইলসন মহাশয় সমীপেষু

'প্রিয় মহাশয়, গতকাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে তখনই জবাব দেব

ভেবেছিলাম, কিন্তু কয়েকটি জরুরী কাজের জন্য দিতে পারিনি। সেজন্য মার্জনা করবেন। আমার ব্যাপারে আপনি এখনও এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করছেন দেখে সত্যিই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনার প্রশ্নগুলি আমার ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রের দিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার উত্তর স্বভাবতঃই একটু দীর্ঘ হবে। এই দীর্ঘ উত্তর আপনাকে কষ্ট করে পড়তে হবে ভেবে লজ্জাবোধ করছি। তবু আপনার মতো একজন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে এরকম একটি দীর্ঘ চিঠিতে অনেক গুরুবিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ যে আপনি দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর। কারও কাছে এমন মতামত আমি কোনদিন প্রকাশ করিনি যাতে আমাকে নাস্তিক মনে করা সম্ভব। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে মন খুলে আলোচনা করা যদি অপরাধ হয়, তা হলে অপরাধী বলে আমি নিজেকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই। এ-বিষয়ে নানামুনির নানামত আছে। সেইমত নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে উন্মুক্ত মনে আলোচনা করেছি। যাঁরা আস্তিক তাঁদের কথা বলেছি, যাঁরা নাস্তিক তাঁদের কথাও বলেছি। যাঁরা অস্তিনাস্তি প্রশ্নই উত্থাপন করতে চান না তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে ভুলিনি। আমি জানি না, এরকম একটি গুরুবিষয় নিয়ে এইভাবে আলোচনা করার মধ্যে অন্যায় কোথায়! একপক্ষের কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করব, অন্যপক্ষের যুক্তি শুনব না বা বিচার-বিবেচনা করব না, এইটাই কি কোনবিষয়ে জ্ঞানলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা? কি করে তাহলে সেই জ্ঞান পূর্ণতালাভ করবে? আর বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, তার ভিত্‌টাই বা কি দৃঢ় হবে যদি না প্রতিপক্ষের মতামত বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার যুক্তি খণ্ডন করার মতো ক্ষমতা থাকে।

এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য বহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরি না করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করব। তাই সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের মতামত নিয়ে অবাধে আলোচনা করতে আমি তাদের উৎসাহ দিতাম। আমার বিশ্বাস, তা না করলে কোনো মানুষেরই অব্যক্ত প্রতিভা ও সুপ্ত মানসিক শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয় না। লর্ড বেকনের ভাষায় বলা যায়, 'if a man will begin with

certainties, he shall end in doubts.' কিন্তু তাতেও দেখলাম যে এক সংশয় থেকে মনে আরএক নতুন সংশয়ের উদয় হয় এবং অবশেষে সংশয়াকুল চিত্তের দোলায়মানতা আর শেষ হয় না কোনদিন। সেইজন্য আমি ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কারণ হিউম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও শাণিত যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। কেবল তাই করেই আমি ক্ষান্ত হইনি। ডক্টর রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তি ও উত্তর হিউম প্রসঙ্গে তাদের পড়িয়েছি। হিউমের যুক্তির এত জোরাল প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেননি। এবং 'This is the head and front of my offending.' ধর্মবিষয়ে ছাত্রদের মজ্জাগত ধ্যানধারণার মূল পর্যন্ত যদি আমার সেই শিক্ষার ফলে নড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আমি কি অপরাধী? তরুণদের মনে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনদিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার। আমাব এই কথা থেকে বুঝতে পারবেন, ছাত্ররা যদি কেউ নাস্তিক হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য নিন্দাবাদ যেমন আমার প্রাপ্য, তেমনি যারা আস্তিক হয়েছে তাদের জন্য সাধুবাদও আমি দাবি করতে পারি।

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশি সজাগ যে অত্যন্ত ছোটখাট বিষয়েও আমি কখনও একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা।

আমার নিজের মনের গড়নও তাই। প্রশ্নহীন সংশয়হীন মন যত শীঘ্র জড়ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে মানসিক অপমৃত্যু বরণ করে, প্রশ্নকাতর সংশয়াতুর মন তত সহজে মানুষকে সন্দেহবাদী বা নাস্তিবাদী করে তোলে না। এটা সত্য নয়, ওটা সত্য, অথবা আমার যা বিশ্বাস সেইটাই ধ্রুব সত্য, এমন কথা হলফ করে কোনো সত্যসন্ধানী কখনই বলবেন না।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের আদেশ পালন করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি কি না? আপনার এই প্রশ্নে

সত্যিই আমি হতবাক হয়ে গেছি। জীবনে কোনদিন কেউ আমাকে এই ধরনের একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন যে করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি পিতামাতাকে শ্রদ্ধেয় মনে করব না, অথবা তাঁদের আদেশ অমান্য করা অন্যায় ভাবি না, আমার বিরুদ্ধে এতদূর হীন অপপ্রচারে যাঁরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন তাঁদের কেবল ঘৃণ্য মনে করেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এ-বিষয়ে আপনাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। আমি যদি পিতৃহীন না হতাম তাহলে আমার পিতাই এই অপপ্রচারের উচিত জবাব দিতে পারতেন। এই বলে জবাব দিতেন যে যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযোগ করেছেন অথবা অন্য যাঁরা এদিক থেকে নিজেদের মহাত্মা বলে মনে করেন, তাঁদের কারও চেয়ে আমি কম পিতৃমাতৃ-ভক্ত নই। হয়ত খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাঁদের অনেকের চেয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য জীবনে আমি অনেক বেশি পালন করেছি। সুতরাং আমি আমার ছাত্রদের যে এরকম শিক্ষা দিতে পারি না তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। বরং তার বিপরীতটাই করেছি। ছাত্রদের মধ্যে যখনই এই ধরনের কোনো মনোভাবের আমি আভাস পেয়েছি, তখনই তাদের রীতিমত ধমক দিয়ে পিতামাতার বাধ্য হতে বলেছি। তবে সমাজে পিতামাতার অনেক তথাকথিত বাধ্য সন্তানকে দেখেছি কুলাঙ্গারে পরিণত হতে, তাই মধ্যে-মধ্যে তাদের সাবধান করে দিয়েছি যে পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়েও মানুষ হওয়া শ্রেয়। কিন্তু পিতামাতার প্রতি ছেলেদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে বরাবর কতখানি সজাগ ছিলাম তার দুটি দৃষ্টান্ত আপনার কাছে উল্লেখ করছি।

যে দু'জন ছাত্র সম্বন্ধে বলছি তারা কলকাতাতেই থাকে, যে-কোনো সময় তাদের ডেকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মাস দু'তিন আগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে আমার একজন ছাত্র (সম্প্রতি তাকে নিয়ে শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল) আমাকে জানায় যে বাড়িতে পিতার নিষ্ঠুর আচরণ তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ি না-ছাড়লে তার উপায় নেই। আমি যদিও ঘটনাটি সব জানতাম, তাহলেও তাকে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করে বুঝিয়ে বললাম, 'অত অধৈর্য হলে চলবে না, মা-বাবার আচরণ

কিছুটা অপ্রীতিকর মনে হলেও সহ্য করা উচিত। বাড়ি থেকে তাঁরা যদি তোমাকে তাড়িয়ে না দেন তাহলে নিজে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেও না।' আমার কথা শুনে দক্ষিণা বাড়িতেই রইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশিদিন থাকতে পারল না। দু'তিন সপ্তাহ আগে আমাকে না জানিয়ে পিতৃগৃহ ছেড়ে আমারই বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হবার পর আমি জানতে পারি। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে না জানিয়ে তুমি বাড়ি ছাড়লে কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আপনি তো তাহলে কিছুতেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে দিতেন না।' এই গেল দক্ষিণারঞ্জনের কথা।

মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আরএকটি ছাত্র তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে, খুড়ো উমাচরণ বসু ও সহোদর নন্দলাল সিংহকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে দেখা করতে আসে। আমি তার অশোভন আচরণের জন্য তিরস্কার করে বলি যে অনুতপ্ত হয়ে পিতার কাছে যদি সে ক্ষমা না চায় তাহলে তার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখব না। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হল, ভাইবোনের বিবাহকে সামাজিক অপরাধ বলে আমি মনে করি কি-না? হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি তা অসঙ্গত বলে মনে করি। এবকম একটা আজগুবি বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতে পারি, একথা আপনারা ভাবলেন কি করে? অবাক হয়ে ভাবি, আমার বিরুদ্ধে এরকম সব বিচিত্র অভিযোগ কোন্ শ্রেণীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে? বিবিধ বিষয় নিয়ে যাঁদের সঙ্গে আমার কোনদিন আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ যে এরকম কুৎসিত মিথ্যা রচনা করবেন তা আমার মনে হয় না। আমার ছাত্রদের আমি বিলক্ষণ চিনি ও জানি। তাদের মধ্যে এমন মূর্খ কেউ নেই যে ভুল বুঝে এই-সব কথা রটনা করবে, অথবা এমন ধূর্তও কেউ আছে বলে আমি জানি না যে স্বেচ্ছায় আমার মতামত বিকৃত করে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করবে। আমার তাই মনে হয়, একশ্রেণীর কাপুরুষ চরিত্রহীন লোক আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। মিথ্যাই তাদের উপজীব্য। ধর্মবিষয়ে কেউ স্বাধীন চিন্তা করলে তাকে

সমাজের লোক নাস্তিক ও নরাধম বলতে পারে, একথা জানি ও বুঝি। কিন্তু অন্য যে-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলি যে এইভাবে কোনো সভ্য সমাজে কোনো সভ্য মানুষের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য উদ্‌ভাবিত হতে পারে, তা আপনার চিঠিতে না জানলে আমার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হত না। আপনি সহৃদয় ব্যক্তি, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, নির্ভয়ে এইসব গুজব ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে ঘোষণা করবেন। গুজব রটনাকারীদের বলবেন, 'I am not a greater monster than most people'.

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি শুনেছি একদল লোক অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে আমার সম্বন্ধে নানারকমের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। কেবল আমাব সম্বন্ধে নয়, আমার পরিবার সম্বন্ধেও তাঁদের কুৎসিত কল্পনা স্কন্ধকাটা প্রেতেব মতো ডানা মেলতে শুরু করেছে। একটি কাহিনী হল, আমার ভগ্নীর সঙ্গে (কেউ বলেছেন আমার মেয়ের সঙ্গে, যদিও আমার কোনো মেয়ে নেই) একজন হিন্দু যুবকের নাকি শীঘ্রই বিবাহ হবে। খবর নিয়ে জেনেছি, বৃন্দাবন ঘোষাল নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই গল্পটি বেশ শ্রুতিরোচক কবে সর্বত্র প্রচার করে বেড়ায়। আমি শুনেছি, এই ঘোষালের পেশা হল, প্রতিদিন সকালে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যতসব আজগুবি খবর সংগ্রহ কবা এবং ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে সর্বত্র তাই পরিবেশন করা। এই ঘোষালের মতো কিছু পেশাদাব গুজব-বসিক চেষ্টা করলে রাতারাতি শিবকেও যে বাঁদর বানিয়ে ফেলতে পাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ? যাই হোক, এ-সম্বন্ধে আর কিছু আমি বলতে চাই না, কারণ অপবাদ বা মিথ্যা গুজব খণ্ডন করার মতো নির্বুদ্ধিতা আব কিছু নেই। এসবের উৎপত্তি যেমন অস্বাভাবিক, অপমৃত্যুও তেমনি স্বাভাবিক।

আপনার প্রশ্নেব উত্তব এখানেই শেষ করলাম। এখন আমি আপনাকে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করব। মিথ্যা জনরবেব ভয়ে অথবা কুৎসা-প্রচারকদের তোষণের জন্য, আমাকে কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করা কি আপনাদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছে ? একথা অবশ্য ঠিক যে আপনাদের সভার কার্যবিবরণেব মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা জনরব রটে তখন তারই ভিত্তিতে যদি তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে সেটা মিথ্যাকেই

প্রশ্রয় দেওয়া হয় না কি ? কেবল জনরব শান্ত করার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে কর্মচ্যুত কবতে বাধ্য হয়েছেন, একথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। আগে থেকেই তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন আমাকে তাড়াবার জন্য। অন্ধ ধর্ম-গোঁড়ামিই আমার প্র্যত তাঁদের বিতৃষ্ণা জাগিযে তুলেছে। তা যদি না হত তাহলে এবকম অভিনব কৌশলে, সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে, এইভাবে তাঁরা আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন না। তাঁদের এই আচরণেব কথা যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই গভীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ্যে অবিচারের প্রতিবাদ করতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ প্রতিবাদ করলে পরোক্ষে তাঁদের মতামতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটুকু মর্যাদাও তাঁদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না।

সুদীর্ঘ চিঠির জন্য আপনার কাছে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং আমার জন্য যে এতসব ঝঞ্ঝাট আপনাকে সহ্য করতে হল সেজন্য সসংকোচে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত

এইচ. এল ভি ডিরোজিও

কেবল চিঠিখানাই যে এখানে শেষ হল তা নয়, ডিরোজিওর একাংক জীবননাট্যেব শেষ দৃশ্যেব পর্দাও এখানে সরে গেল।*

* ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি সম্পর্কে সভার বিবরণ, প্রস্তাব ও চিঠিপত্র হিন্দুকলেজের প্রাচীন নথিপত্র থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে ছাপা হয়েছে।

উইলে তালিকাবদ্ধ ডিরোজিওর জিনিসপত্র

৭. চিন্তাবিপ্লব

চিঠির তারিখ ২৫ এপ্রিল ১৮৩১, আর ডিরোজিওর মৃত্যুর দিন ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। মাত্র আট মাসের ব্যবধান।

উইলসনকে ডিরোজিও লিখেছিলেন, শিক্ষকের কাজই যে ভবিষ্যতে করব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিচিত্র কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনতরী কোথায় কোন্ অজানা বন্দরে ভিড়বে তা-ও তিনি জানেন না। মনেহয় শিক্ষকের কাজ করার আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না। প্রথম যৌবনে, শিক্ষকতার সাধনার ফলে, অমৃতের বদলে যে গরল ঠেলে উঠবে সমাজের বুকে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তাছাড়া এই অপমান ও আঘাত সহ্য করার পর কোথায় বা তিনি শিক্ষকের কাজ করতে যাবেন? করতে গেলেও, মাথা তুলে কাজ করবেন কি করে? আর হিন্দুকলেজ ছাড়া তেমন বিদ্যালয়ই বা কোথায় তখন যেখানে তিনি তাঁর মনের মতো ছাত্র পাবেন এবং স্বাধীনভাবে তাঁদের শিক্ষা দিতে পারবেন? কবি ও

সাংবাদিকের স্বাধীন জীবনযাপন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। তাঁর পরবর্তী কাজকর্ম দেখে এই কথাই মনে হয়। বয়সের চেয়েও মনের তারুণ্য তাঁর এত বেশি উদ্দাম ছিল যে চাকরির চিন্তা তাঁর মনে বিশেষ জাগেনি। স্বাধীন সাহিত্যিকবৃত্তির যে বাসনা দীপশিখার মতো তাঁর মনে জ্বলে উঠেছিল তা যে নিয়তির ফুৎকারে এত দ্রুত দৈবাৎ নিভে যাবে, তা-ও তাঁর জানবার কথা নয়।

My sceptre from my hand is riven,
Save Honour, all is lost !

কলেজ থেকে পদত্যাগের চারবছর আগে ১৮২৭ সালে রচিত তাঁরই কবিতার এই দুটি লাইনে হয়ত তখন তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতেন। তাঁর হাত থেকে যে রাজদণ্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা কেবল একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের রাজদণ্ড নয়, বাংলা দেশের নবযুগের শিক্ষাগুরুর রাজদণ্ড।

কিন্তু এক্ষেত্রে কি তিনি তাঁর সম্মানটুকু রক্ষা করতে পেরেছিলেন? তাও পারেননি। তাঁর মতো আত্মাভিমানী তরুণের আত্মসম্মানই বড় সম্পদ, সামাজিক সম্মানও কম কাম্য নয়। আত্মসম্মানের ঔজ্জ্বল্য অভিমানের উত্তাপে হয়ত আরও তীব্ররূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু সেই সামাজিক সম্মান সাময়িকভাবে অন্তত ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর স্বল্পায়ুর দিক থেকে এই সাময়িক ক্ষতিটাই চূড়ান্ত ক্ষতি বলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটা এত বেশি মর্মান্তিক। কিসের জন্য তাঁকে এই দুঃসহ অপমান ও কলঙ্কের বোঝা যে বহন করতে হল তা কে বলবে? দৈত্যাকার মিথ্যার তাণ্ডবনৃত্যের দাপটে একজন তরুণ শিক্ষকের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিহাসের পাতায় শুধু এটুকুই কি লেখা থাকবে?

অতীত যদি কথা বলতে পারত তাহলে সমাজকেই দায়ী করত এই নিষ্ঠুরতার জন্য। বহুকাল ধরে এই নিষ্ঠুরতার নাটক অভিনীত হচ্ছে সমাজের রঙ্গমঞ্চে, স্থিতস্বার্থের চক্রান্তে।' কেবল রাজনীতির স্বার্থ নয়, অর্থের স্বার্থ নয়, তার চেয়েও বৃহত্তর স্বার্থ ধর্মের স্বার্থ, শাস্ত্রের স্বার্থ, প্রথা ও সংস্কারের স্বার্থ। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার গহন অন্ধকারে নির্বাসিত করে মুষ্টিমেয় একদল স্বার্থান্ধ মানুষ চিরকাল ঈশ্বরের পৌরোহিত্য, পরকালের দৌত্য

এবং সমাজের নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে এসেছে। এই সহজ অথচ সাংঘাতিক সত্যকথাটার সঙ্গে যখন কেউ সরল সাধারণ মানুষের মুখোমুখি পরিচয় করে দিতে চেয়েছে, তখনই ঘোর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার জীবনে ও বাইরের সমাজে। বিজ্ঞানের অগ্রদূতকে পিশাচ বলে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, স্বাধীনতার শহীদকে বলা হয়েছে স্বেচ্ছাচারী দানব, সত্যের পূজারীকে বলা হয়েছে পাষণ্ড প্রতারক, জ্ঞানের সাধককে বলা হয়েছে ভণ্ড বিড়ালতপস্বী। এই কারণে আমাদের দেশে নবযুগপ্রবর্তক রামমোহন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন, বিদ্যাসাগর উপেক্ষিত হয়েছেন, সমাজ-জীবনে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেছেন এবং আজও পর্যন্ত লোকচিত্তকে কৃতজ্ঞতায় উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেননি। ডিরোজিও একই কারণে কলঙ্কিত হয়েছেন এবং আজও বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর সান্ত্বনা এই যে তিনি জাতিতে বাঙালী হিন্দু নন, মুসলমান নন, একজন ফিরিঙ্গি।

হঠাৎ যে-ঝড় উঠে তাঁর প্রকাশোন্মুখ জীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল, তার উৎস কোথায়? বাংলার তরুণ ছাত্রদের কেবল কলেজের ছাত্র মনে না-করে, নবযুগের রূপকার মনে করে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন, এই কি তাঁর অপরাধ, এবং এই কি ঝড়ের কারণ? অগণিত চাকরের মতো তিনি নিশ্চিন্তে চাকরি করতে পারেননি, এবং চক্রবৎ রুটিনের চাকায় ঘুরতে-ঘুরতে জীবনটাকে আরও দশজনের মতো বিকৃত বিজৃম্ভণে কাটিয়ে দিতে পারেননি, এইটাই কি তাঁর অপরাধ এবং ঝড়ের কারণ? নবীন বাংলার তরুণ ছাত্রদের তিনি নবযুগের নির্মল যুক্তি ও শাণিতবুদ্ধির বলে বলীয়ান নির্ভীক সমাজসেনা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এই তাঁর অপরাধ, এবং এইটাই তাঁকে ঘিরে ঝড় ওঠার কারণ।

ডিরোজিও নিজেই বা কোথা থেকে ঝড়ের এই উৎসটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন? কী সেই জীবনমন্ত্র, কী সেই অমূল্যজ্ঞানের রত্ন, কী-ই বা সেই বিদ্যা, যার জাদুস্পর্শে এদেশের অচল-অটল সমাজের বড়-বড় পাথুরে স্তম্ভগুলি পর্যন্ত নড়ে উঠল?

যে যুক্তি ও বুদ্ধির জ্যোতিতে ডিরোজিও বাংলার তরুণদের জীবনের

পথ আলোকিত করতে চেয়েছিলেন তার বিকাশ হয় আঠার শতকে। এইসময় মানবসমাজে এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিবিপ্লব ঘটে এবং তমসার সমুদ্রগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল যুক্তির উদ্‌ভব হয়। সতের শতকে বেকন (Bacon) ও লক (Locke) সংস্কার-শৃঙ্খল থেকে মোহাচ্ছন্ন মানববুদ্ধির মুক্তির বাণী ঘোষণা করেন। আরিস্ততলের অনুমান-ন্যায়ের পথ ছেড়ে বেকন অনুসন্ধান-পরীক্ষার দ্বারা কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয়ের ও সত্যানুসন্ধানের নতুন পথনির্দেশ করেন। জনশ্রুতি, কুসংস্কার, আপ্তবাক্য প্রভৃতি নানারকমের ভূতেরা দৌরাত্ম্য করে এই সত্যের পথে। তাদের সাহস করে বিদায় করতে না পারলে সত্যের আলোকসন্ধান অবশেষে আলেয়ার পশ্চাদ্‌ধাবনে পরিণত হয়। লক্ বলেন যে প্রাচীন দার্শনিকদের মতামত অধিকাংশই অর্থহীন বাক্যের পসরা ছাড়া কিছু নয়। মানসপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত যা কিছু তা আমাদের জানবার কোনো উপায় নেই।

আঠার শতকে বেকন ও লক প্রদর্শিত এই যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তা আরও কয়েকজন মনীষী ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তাঁদের একেশ্বরবাদী বা ডীয়িস্ট (Deist) বলা হয়। তাঁরা ছাড়াও ফ্রান্সের এনসাইক্লোপিডিস্টরা যুক্তিবাদের পথে দুর্দান্ত অভিযান শুরু করেন। তাঁদের প্রধান সমালোচনার পাত্র হলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা। স্বনামধন্য হলেন ভল্টেয়ার, দিদেরো, হেলভিটিয়াস, দা'লেমবের, হলব্যাখ, কণ্ডের্সে, রুশো ও ভল্‌নি। কেউ ছিলেন নাস্তিক জড়বাদী, কেউ ঘোর সংশয়বাদী এবং কেউ বা অদ্বৈতবাদী! ভল্টেয়ার, রুশো ও ভলনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। হলব্যাখ, হেলভিটিয়াস, লা মেত্রি ও দিদেরো ছিলেন নাস্তিক। এঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব এবং পাপপুণ্যের পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস করতেন না। দার্শনিক ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, অলৌকিক ক্রিয়ায় (miracles) তাঁর আস্থা ছিল না। স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও নানামতকে হিউম চতুর যাজকপুরোহিতদের স্বার্থজনিত সৃষ্টি বলে প্রচার করেন। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য সমাজে এই বৈপ্লবিক চিন্তালোড়ন চলতে থাকে। নবযুগের বাংলার নতুন বিদ্যামন্দিরে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে হিন্দুকলেজে, এই নব্যচিন্তার বার্তা স্বাভাবিকভাবেই

পৌছয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মতে হিন্দুকলেজ ছিল : 'The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan.' কলেজ প্রতিষ্ঠার এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে পাশ্চাত্য-ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ডঃ টাইটলার ও ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন প্রমুখ ছু'চারজন সাহিত্যদর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ইংরেজও ছিলেন। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ভগীরথ হয়ত তাঁদেরই হওয়া উচিত ছিল। তাঁরা যে একেবারেই তা হননি তা নয়। কিন্তু ডিরোজিওর মতো বিষাণ বাজিয়ে ঘুমন্ত সমাজকে কেউ এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে পারেননি। ডিরোজিওকে কোনমতেই বিদেশী ইংরেজ বলা যায় না, এবং জাতিতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি হলেও ভারতীয়ই তাঁকে বলতে হয়। একথাও স্বীকার করতে হয় যে ভারতীয় ডিরোজিও, তাঁর পূর্বসূরী রাম-মোহনের মতো নবযুগের পাশ্চাত্য আদর্শের প্রবাহকে বাংলার তথা ভারতের জীবনগঙ্গার সঙ্গে মিলিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এরকম সক্রিয় ও দুঃসাহসিক চেষ্টা তাঁর আগে আর কেউ করেননি।

হিন্দুকলেজের আগে ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে এদেশী ও বিদেশী ছাত্ররা একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার তীর্থসঙ্গম স্কচ শিক্ষক ড্রামণ্ড আগেই ধর্মতলাতে রচনা করেছিলেন। হিন্দুকলেজের মতো তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু এদেশের ইউরোপীয় জ্ঞানবিস্তার 'channel' হিসেবে তার গুরুত্বও কম ছিল না। কলকাতা শহরে ধর্মতলায় পূর্ব-পশ্চিমের এই মিলনতীর্থে ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেছিলেন। শিক্ষক ড্রামণ্ড শুধু যে স্কটল্যাণ্ডের একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী স্কচ দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। কুসংস্কার ও ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং জীবনটাকে মনে করতেন জ্যামিতির মতো প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। 'সম্যক বিষয়জ্ঞানকে তিনি ঈশ্বর-জ্ঞান মনে করতেন এবং বন্ধনহীন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিকে বলতেন নবযুগের যাজক। জ্ঞানাতীত, যুক্তিবহির্ভূত যে-সব বিষয়, তাঁর মতে তা মানুষের বিবেচ্য নয়। অ্যাকাডেমিতে এই যুগচিন্তার বীজ ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর মনে

বপন করেছিলেন। ডিরোজিওর মানসভূমিতে সেই বীজ অল্পদিনের মধ্যে সোনা ফলিয়েছিল। সেই সোনার ফসলের বীজ ডিরোজিও নিজে আবার হিন্দুকলেজে তাঁর ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে আবাদ করেছিলেন। মাত্র দশ-বার বছর পরের কথা। তাঁর ফসলের ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাঙালীসমাজ। নব্যবঙ্গের তরুণদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও শাণিত যুক্তির তরবারি যখন ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন করে জ্ঞানের আলোকে বিচ্ছুরণের জন্য উদ্যত হয়ে উঠল, তখন সোরগোল পড়ে গেল রক্ষণশীল সমাজে। তাঁরা শিউরে উঠলেন, রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে নয়, চিন্তা-বিপ্লবের আতংকে।

সমাজে যতরকমের বিপ্লব আছে, তার মধ্যে চিন্তাবিপ্লবই সবচেয়ে ভয়ংকর। সেই বিপ্লবের মারাত্মক লক্ষণ দেখে প্রবীণেরা সন্ত্রস্ত হলেন। ত্রাস থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হল এবং সমস্ত ধূমায়িত আক্রোশ বজ্রের মতো কিভাবে তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর মাথার উপর ফেটে পড়ল তা আমরা দেখেছি।

স্বভাবতঃই সকলে বলবেন যে কলকাতার হিন্দুসমাজের 'বর্তমান মানসিক উত্তেজনার কাছে' একজন যুবকের জীবন এইভাবে নিঃসংকোচে উৎসর্গ করা যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন। কিন্তু যুক্তি ও হৃদয়ের দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের সমাজ সবসময় সোজা হয়ে এগিয়ে চলে না। তা যদি চলত তা হলে সামাজিক জীবনে যুগে-যুগে সংকটের প্রলয়মেঘ ঘনিয়ে উঠত না। যুক্তি ও হৃদয়ের শক্তি ক্ষয় হয়ে-হয়ে যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই সমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো ভেঙে পড়ে, তার আর চলার শক্তি থাকে না। বাংলার সমাজের এরকম এক সংকটকালে ডিরোজিওর জীবন জনশ্রুতির পূজায় নিবেদন করেছিলেন হৃদয়হীনেরা, কারণ পঙ্গু সমাজের দেহে চলৎশক্তি সঞ্চারের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিরোজিও।

জনতার উত্তেজনা নয় শুধু, স্মৃতিশক্তিও অস্থায়ী। হিন্দুকলেজ ও ডিরোজিওমুখী প্রবল উত্তেজনার স্রোত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি বটে, কিন্তু তারই আবর্তে ডিরোজিওর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল, আর তা আত্মপ্রতিষ্ঠা পেল না। ঝড়ের পর নতুন সূর্যোদয় দেখার জন্য ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না। তাঁর **'Morning after a Storm'** কবিতাটি মনেহয় যেন তাঁর

I wandered forth, and saw the great nature's power.
The Hamlet was in desolation laid
By the strong spirits of the storm ; there lay
Around me many a branch of giant trees
Scattered as leaves are by the southern breeze,
Upon a brook, on an autumnal day ;
Cloud piled on cloud was there, and they did seem
Like the fantastic figures of a dream,
Till morning brighter grow, and then they
rolled away.

'অবাক হয়ে আমি দেখেছিলাম প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, উন্মত্ত ঝড়ের দাপটে কেমন করে ধূলিসাৎ হয়ে গেল কুঁড়েঘরটি। আমার চারিদিকে বড়-বড় মহীরুহের ডালপালা ছড়ানো, নদীতটে দক্ষিণেহাওয়া হেমন্তে যেমন পাতা ছড়ায় তেমনি। মেঘের উপরে মেঘ জমে আছে, দেখে মনেহয় যেন স্বপ্নঘোরের ভয়ংকর প্রেতমূর্তি সব। ভোরের আলো যখন উজ্জ্বলতর হল, তখন আলোয় মিলিয়ে গেল সেই সব দৈত্যাকার মেঘ।'

ঝড়ের পরে সমাজের আকাশে এই দৈত্যাকার মেঘপুঞ্জকে ডিরোজিও উদার আলোর বুকে বিলীন হতে দেখেননি।

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now,
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish from thee ;

1827

৮. সংঘর্ষ

শিক্ষকতা ছেড়ে ডিরোজিও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের যুগে সামাজিক আন্দোলনের ও জনমত গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল সংবাদপত্র। ডিরোজিও তা জানতেন, তাই পত্রিকার ভিতর দিয়ে তাঁর মতামত ও আদর্শ প্রচারের জন্য প্রস্তুত হলেন। মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে তার পরেও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বা অনুরূপ কোনো আলোচনা-সভার বৈঠক বসত কি-না জানা যায় না। অন্তত তার কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি। পরিবেশ যেরকম উত্তপ্ত হয়েছিল তখন, তাতে মানিক-তলায় ডিরোজীয়ানদের বিতর্কসভা বসলে ক্ষিপ্ত জনতা হয়ত বা চড়াও হত সেখানে। জনতাকে লেলিয়ে দেবার মতো প্রভাবশালী গোঁড়া হিন্দু সমাজনেতারও অভাব ছিল না।

পত্রিকা কেবল ডিরোজিও নিজে প্রকাশ করেননি, তাঁর প্রিয় ছাত্রদেরও

সেই কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে) আঠার বছর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বয়স সতের বছর, রামগোপাল ঘোষের বয়স ষোল বছর এবং ডিরোজিওর নিজের বয়স বাইশ বছর। অ্যাকাডেমিক সভায় তিনি ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধি নয় শুধু, বাগ্মিতাবিকাশেও সাহায্য করেছেন। সভায় কৃষ্ণমোহন ছিলেন 'the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm and unimpassioned, though sometimes bursting forth into vehemence', এবং যে রামগোপাল ঘোষ তাঁর বাগ্মিতার জন্য 'ডেমস্থেনীস' আখ্যা পেয়েছিলেন, 'this debating club was to him what the Oxford club had been to many an English orator.' গুরুগম্ভীর জটিল বিষয়ের বিতর্কে ষোল-সতের-আঠার বছরের তরুণদের এই প্রতিভার বিকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। ডিবেটিং ক্লাবের বাগ্মিতার বদলে এবারে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তেজোদীপ্ত তারুণ্যের কঠিন পরীক্ষার সময় এল।

সিংহাসনচ্যুত গুরুর কাছে শিষ্যবৃন্দ সমবেত হলেন সংকটকালে উপদেশ ও উৎসাহের জন্য। বিদ্বৎসভার সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বাকযুদ্ধ করলে আর চলবে না। তরবারির চেয়েও শতগুণ শক্তিশালী লেখনী ধারণ করে প্রকাশ্য জনসমাজে অন্ধ গোঁড়ামি ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে নিরন্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

আঠার বছরের যুবক কৃষ্ণমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ইংরেজি *The Enquirer* পত্রিকা ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে, অর্থাৎ ডিরোজিও কলেজ ছাড়ার মাসখানেকের মধ্যে। জুন মাসের গোড়াতে সতের বছরের তরুণ দক্ষিণারঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বাংলার সাপ্তাহিক পত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'। ডিরোজিও নিজে তাঁর সমস্ত সম্বল উজাড় করে *The East Indian* নামে একখানি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ৯ নম্বর কসাইতলা থেকে (১১ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট)। পত্রিকার নামকরণ থেকে বোঝা যায়, কেবল এদেশের হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য নয়, নিজের নির্যাতিত ও অবহেলিত ফিরিঙ্গিসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্যও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'এনকয়ারার' পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে প্রথম সংখ্যায় কৃষ্ণমোহন লেখেন: **'Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness.'** দক্ষিণারঞ্জনের বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার আদর্শ প্রচারিত হল এই সংস্কৃত শ্লোকটিতে

এহি জ্ঞান মনুষ্যানামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

মানুষের অজ্ঞানতার তিমির হরণ করে, দয়া ও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতাকে সংহার করে জ্ঞানের বিকাশের পথ প্রশস্ত করাই পত্রিকার আদর্শ। বছর দুই পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজি-বাংলা-দ্বিভাষী পত্রিকায় পরিণত হয়। কৃষ্ণমোহন ও দক্ষিণারঞ্জন প্রধানত হিন্দুসমাজ নিয়ে এবং ডিরোজিও নিজে ফিরিঙ্গিসমাজ নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ডিরোজিওর ফিরিঙ্গি চরিতকার এডওয়ার্ডস বলেছেন যে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকা হল **'the first newspaper that was the recognised organ of Eurasians and which advocated their claims ... with an eloquence and a power of argument of which East Indians may well be proud'**

ডিরোজিও মধ্যে-মধ্যে কৃষ্ণমোহন ও দক্ষিণাকে উপদেশ পরামর্শ দিতেন, 'এনকয়ারার' পত্রিকায় তাঁর পক্ষে লেখাও সম্ভব, কিন্তু নিজে ফিরিঙ্গি বলে মনেহয় তিনি দূরে সরে থাকাই পছন্দ করতেন। হয়ত তিনি ভাবতেন, ফিরিঙ্গি হয়ে হিন্দুসমাজের সংস্কারক হবার চেষ্টা করলে খ্রীস্টান পাদ্রিদের মতো তাঁকেও উপহাসের পাত্র হতে হবে। তাই বোধহয় দু'জন হিন্দু ব্রাহ্মণ যুবককে হিন্দুসমাজের সংস্কার-সংগ্রামে সামনে এগিয়ে দিয়ে ডিরোজিও নিজে ফিরিঙ্গিসমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সারা জুলাই মাস ধরে (১৮৩১) কলেজের তরুণদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে চলল। বিক্ষোভ ক্রমেই যেন বাড়ছিল মনে হয়। ১৬ জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন, 'অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমার-দিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেস্টর এবং পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতি দেন যে হিন্দুকলেজের ছাত্ররা ফিরিঙ্গির মতো পরিচ্ছদ না করিতে পায়

যথা ফিরিঙ্গির জুতা পায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় মেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি।' অভিযোগের ভাষা দেখে বোঝা যায়, বিরক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাত্রা কোথায় পৌঁছেছিল। ১৪ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় উদ্ধৃত 'সংবাদ প্রভাকরের' একটি চিঠিতে এই বিচিত্র ঘটনাটির উল্লেখ দেখা যায়

কলকাতার একজন গৃহস্থ ভদ্রলোক নিজের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে '৺জগদম্বার দর্শনে' কালীঘাটে এসে এক দোকানে বাসা করেন। অতঃপর গঙ্গাস্নান করে পূজার নৈবেদ্যাদি নিয়ে 'জগদীশ্বরীর সন্নিধানে' উপস্থিত হয়ে 'তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম' করেন, কিন্তু 'উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি' প্রণাম করেন না। তার পরিবর্তে 'ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল', অর্থাৎ দেবী কালীকে সম্বোধন করে বলল, গুড মর্ণিং ম্যাডাম। 'ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া' পলায়ন করলেন। তারপর তার পিতা তাকে প্রহার করার জন্য উদ্যত হলে জনৈক ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, ক্ষান্ত হন, এখানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়। তাতে সেই বেল্লিক বালকের পিতা আক্ষেপ করে ছেলেকে বললেন, 'ওরে আমি কি ঝকমারি করে যে তোকে হিন্দুকলেজে দিয়েছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাত মান সব গেল।' ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'জানেন মশায়, এই কুলাঙ্গারের জন্যে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারি না, ধর্মসভায় যেতে পারি না।' তাঁর এই খেদোক্তি শুনে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছি কলকাতার অনেক বাঙালী বড়মানুষ হিন্দুকলেজের ম্যানেজার, তাহলে কেন ছেলেদের এরকম কুশিক্ষা হয়? এই কথার উত্তরে ছেলের পিতা বললেন, আর মশায়, বাঙালী বড়মানুষের গুণের কথা বলবেন না। ঘরের টাকা দিয়ে তাঁরা দেশের ছেলেদের পরকাল টনটনে করছেন।

ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ২ মে ১৮৩১ ইংরেজিবিদ্যার সঙ্গে নাস্তিকতার সম্পর্ক বিষয়ে যে প্রবন্ধ লেখেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। হিন্দুকলেজের ও ডিরোজিওর ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষার ফলে কেন যে নাস্তিক হয়ে উঠছেন, চন্দ্রিকার কাছে তা বোধগম্য নয়। ইংরেজি শিখলেই যে নাস্তিক হতে হবে, চন্দ্রিকা তা মনে করেন না। তাঁরা বলেন, আগে যে

সব দেওয়ান মুচ্ছুদ্দি ছিলেন তাঁরা ইংরেজি শিখে 'সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম সুসম্পন্নপূর্বক বহুধনোপার্জন' করেছিলেন এবং ইংরেজরা তুষ্ট হয়ে তাঁদের নানাপ্রকারের মর্যাদা প্রদান করতে কুণ্ঠিত হননি। অবশ্য একথা ঠিক যে মুচ্ছুদ্দিরা ভাল ইংরেজি জানতেন না। কথিত আছে ঢেঁকির বিবরণ দিতে গিয়ে কোনো মুচ্ছুদ্দি সাহেবের কাছে বলেছিলেন, 'টুমেন ধাপুড় ধুপুড়, ওয়ান মেন সেঁক্ে দেয়।' কিন্তু তাতে কি? এই ইংরেজি শিখেই তাঁরা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী লোক হয়েছিলেন এবং কাজকর্মও বেশ উত্তমরূপে নির্বাহ করতে পারতেন। এঁদের পরবর্তীকালে যারা দেওয়ান মুচ্ছুদ্দি হলেন—যেমন হরিমোহন ঠাকুর, নীলমণি দত্ত, তারিণীচরণ মিত্র, গঙ্গাধর আচার্য, নীলমণি দে, প্রভৃতি তাঁরা অনেকেই ইংরেজিবিদ্যায় 'বিলক্ষণ পারগ' হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য তাঁরা নিজেদের ধর্মকর্ম বিসর্জন দেননি। তারপর যাঁরা মুচ্ছুদ্দি ও জমিদার হন তাঁদের মধ্যে উমানন্দন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, হরচন্দ্র লাহিড়ী, রসময় দত্ত, শিবচন্দ্র দাস, রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইংরেজিবিদ্যায় যেরকম পারদর্শী হয়েছিলেন তা 'বাঙ্গালি ও ইংরাজ' সকলেই জানেন। অথচ এঁরা কেউ 'আপন ধর্ম কর্ম অমান্য করেন নাই এবং নিষ্কর্মান্বিত কথন নহেন।' এঁরা কেউ দেওয়ান, কেউ গ্রন্থকর্তা, কেউ সেরেস্তাদার, কেউবা খাজাঞ্চির বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত থেকে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন।

সামাজিক ইতিহাসের এইটুকু প্রস্তাবনাকারে বিশ্লেষণ করে চন্দ্রিকা লিখেছেন: 'এক্ষণে যাঁহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক, ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে, তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে।' চন্দ্রিকার ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড অত্যন্ত নীরেট। ইংরেজি শিখে নাস্তিক হলে ইংরেজরা খুশি হয়ে যদি ভাল চাকরি দিতেন এবং বহু টাকা উপার্জন করা যেত, তাহলেও বরং নাস্তিকতা অনেকটা সার্থক হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন নাস্তিক হয়ে লাভ কি? আগেকার লোক অল্প ইংরেজি-বিদ্যার

জোরে ধর্মকর্ম করে, দেওয়ানী, সেরেস্তাদারী প্রভৃতি বড় বড় চাকার করেছেন, আর আজকালকার যুবকরা তাঁদের চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজি শিখে কেউ পাঠশালাব টিচার, কেউ-বা ষোলটাকা মাইনের কেরানী হচ্ছেন, আর কেউ-কেউ অভিমান করে ঘরে বসে বিদ্যালয়ে প্রাইজপাওয়া পুস্তকগুলি নাড়াচাড়া করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। অতঃপর চন্দ্রিকা দুঃখ করে বলেছেন যে যতদিন পিত্রালয়ে আহারের সংস্থান আছে ততদিন চিন্তা নেই, কিন্তু পরে যে এঁরা কি করবেন তা ঈশ্বরই জানেন! যীশুখ্রীস্টভজনে মজে গিয়ে প্রথমে এদেশের হতভাগ্য অনুন্নত জাতির যে অবস্থা হয়েছিল, এই ইংরেজি কেতাদুরস্ত নাস্তিকদেরও পরে সেই অবস্থা হবে। এদেশের অশিক্ষিত লোকরা মনে করেছিল, পাদ্রিদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, যে খ্রীস্টান হলে একটি সুন্দরী বিবি, একখানি বাড়ি আর একলক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু খ্রীস্টান হবার পরে তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে বাগানের মালী, দ্বারোয়ান ও খিদমৎগারের চাকরি। আমাদের হিন্দুকলেজের বাহাত্তুরে হিন্দু নাস্তিকদের অদৃষ্টেও তাব চেয়ে লোভনীয় কিন্তু জুটবে বলে মনে হয় না। এই হল চন্দ্রিকাব সমালোচনার সুর।

পত্রপত্রিকার এইসব সমালোচনা থেকে বোঝা যায়, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে ধর্মসভার বিষোদ্‌গার ডিরোজিওব পদচ্যুতির পরেও পূর্ণমাত্রায় চলছিল। দুর্মর সমালোচনার ঘন-ঘন কামান-গর্জনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তরুণের দল। জুলাই মাসের শেষে (১৮৩১) কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকয়ারারে' লিখলেন

> [illegible] age of persecution is still vehement. The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the *Gurum Shabha* is violent, and they know not what they are doing. Excommunication is the cry of the fanatic. We hope perseverence will be the liberal's answer. The *Gurum Shabha* is high; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage; let them burst forth into a flame. Let the liberal's voice be like that of the Roman knows not

only to act but to suffer. Blown be the trumpet of excommunication from house to house. Be some hundreds cast out of society; they will form a party, an object devoutly to be wished by us.

কৃষ্ণমোহনের জবাবের তাৎপর্য এই : আমাদের উপর উৎপীড়ন এখনও পূর্ণমাত্রায় চলেছে। গোঁড়ার দল এখনও ক্ষিপ্ত হয়ে কটূক্তির কামান দাগছেন। গুড়ুমসভার গরম ক্রমেই অসহ্য ও মারমুখী হয়ে উঠেছে। সভার পোষকরা জানেন না তাঁদের এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল কি। ধর্মোন্মাদরা দাবি করছেন যে আমাদের জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত করবেন। আমরা উদারপন্থীরা এর জবাব দেব আমাদের ধৈর্য ও সহ্যগুণ দেখিয়ে। গুড়ুমসভার দাপট বাড়ে তো বাড়ুক, তাঁরা ক্রোধে টগবগ করতে-করতে ঔদ্ধত্যের চূড়ায় উঠুন। তাঁদের বিক্ষোভ-বিতৃষ্ণা দাবানলের মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক। আমরা উদার। আমরা তাতে ভয় পাব না, নির্ভীক রোমানের মতো আমাদের কাজ করে যাব এবং তারজন্য যত নির্যাতনই সহ্য করতে হোক, তাও করব। সমাজচ্যুতির বিষাণ ধর্মধ্বজীবা যদি বাজাতে চান তো বাজান, ঘরে-ঘরে তা বেজে উঠুক। কয়েকশত বিদ্রোহী তরুণ ঘর ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় থেকে উন্মুক্ত পথের উপর অসহায়ের মতো নিক্ষিপ্ত হোক। তারা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে একটা প্রচণ্ড দল গড়ে তুলবে, আমাদের উদ্দেশ্যও তখন সফল হবে।

এনকয়ারার' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহন তখন এইবকম আবেগপূর্ণ ভাষায় তরুণদের উৎসাহিত করছিলেন। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর কলম দিযে অনর্গল বিদ্রোহের অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল। বেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন

Week after week he put in the columns of the *Enquirer* the orthodox Hindus into the pillory. He thus became, amongst the band of reformers, the most uncompromising denouncer of the national superstition. His house became the resort of those young men who had perceived the absurdity of the national religion, and were breaking through the fetters of caste.

বিদ্রোহী তরুণদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণমোহন। ডিরোজিওর পদচ্যুতি গোঁড়া হিন্দুসমাজের প্রতি তরুণদের আরও বেশি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। ধর্মসভার বিরূপ সমালোচনা তাতে ইন্ধনও যোগাচ্ছিল অনবরত। কৃষ্ণ-মোহনের গৃহে তরুণদের সভা বসত, নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা হত এবং সংগ্রামের কৌশল ও পথ ঠিক করা হত অবস্থা বুঝে। শিক্ষকের অপমানের আঘাত শিক্ষক নিজে ভুলে যাবাব চেষ্টা করলেও, তাঁর ছাত্ররা তা কিছুতেই ভুলতে পাবছিলেন না। কারণ তাঁদেরই অভিভাবক, পিতা-পিতামহ ও আত্মীয়স্বজনবা হিন্দুসমাজের কর্ণধার হয়ে সকলের প্রিয় শিক্ষক ডিবোজিওকে অপমানিত করে পদচ্যুত করেছেন, এবং শুধু তাই নয়, তাঁব নির্মল চরিত্রে মিথ্যা অভিযোগের কলংক লেপন করেছেন। কৃষ্ণমোহনের গৃহে মিলিত হয়ে তরুণবা এই অন্যাযেব প্রতিকাব সম্বন্ধে চিন্তা কবতেন, এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকযাবার' পত্রিকায় সেই চিন্তাব ও আলোচনার ফলাফল প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ কবতেন।

এমনসময় হঠাৎ একদিন একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার স্থান হল কৃষ্ণমোহনেব বাড়ি এবং পাত্রদল হলেন তাঁব তরুণ বন্ধুবান্ধব। কৃষ্ণ-মোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্য কলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁব বাড়ির উত্তরে ভৈববচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ২৩ আগস্ট ১৮৩১। কৃষ্ণমোহন কোনো কাজে সেদিন বাইবে বেবিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে বন্ধুবান্ধবরা দলবেঁধে তাঁর বাড়িতে এসে বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গরম-গরম কথাবার্তা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সেই উত্তেজনার বশে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি ও গোমাংস নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আবম্ভ করেন। ব্যাপারটা তাতেই শেষ হয় না। ভক্ষণান্তে গোমাংসের হাড়গুলি উল্লাস-ধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদেব বাড়িব ভিতরে নিক্ষেপ করা হয়। গো-হাড় গো-হাড় ধ্বনি শুনে চক্রবর্তীরা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেদের কীর্তি দেখে স্বভাবতঃ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বালখিল্যদের এই ঔদ্ধত্য তাঁদের অসহ্য মনে হয়। ব্রাহ্মণ-প্রধান পাড়ায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণ-মোহনের বন্ধুদের প্রহার করতে উদ্যত হন। অশ্রাব্য কটুবাক্য ও

অভিসম্পাত তরুণদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। প্রহারের ভয়ে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দৌড় দেন। কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন বাড়িতে ফেরা-মাত্র প্রতিবেশীরা সমস্বরে দাবি করেন যে তাঁর ছোট ভাইটিকে কিছুতেই আর বাড়িতে স্থান দেওয়া চলবে না, আসামাত্রই বিদায় করতে হবে।

তাই করা হল। কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফিরে আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন। সকলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। পিতৃস্থানীয় প্রতিবেশীরা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে অবিলম্বে বাড়ি ও পাড়া ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করলেন। আদেশ তাঁকে শিরোধার্য করতে হল। কৃষ্ণমোহন পৈতৃক গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন।

গৃহত্যাগ করেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। শোনা যায়, এই সময় তাঁকে রাস্তাঘাটে প্রহার করা, এমনকি গোপনে হত্যা করারও চক্রান্ত করা হয়েছিল। রাজনীতির যুগের আগেও দেখা যায় ধর্মনীতির যুগে সমাজের বড় বড় দলপতিরা ভাড়াটে গুণ্ডা পোষণ করতেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়, আরও প্রায় পঁচিশ বছর পরে, বিদ্যাসাগরকেও এইভাবে লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। রামমোহনকেও যে এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি তা মনে হয় না। কৃষ্ণমোহন ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের উপর আক্রোশের উপশম হল না সহজে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর কলকাতা শহরে হিন্দুপল্লীতে আশ্রয় পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন সাহস করে নিজের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু মাসখানেকের বেশি সেখানে থাকাও সম্ভব হল না। দক্ষিণার আত্মীয়স্বজন এবং সেই পাড়ার লোকজন সকলে ক্রমে তাঁদের আপত্তি জানাতে লাগলেন। অবশেষে ২৮ সেপ্টেম্বর ৮৩১ কৃষ্ণমোহন বন্ধুর বাড়ি ছেড়ে চৌরঙ্গি অঞ্চলে এক সাহেবের গৃহে অতিথিরূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। শহরের কোনো হিন্দুপল্লীতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করলেন না।

তরুণদের এই আচরণ অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয। নিছক কিশোরসুলভ চাপল্যের বশেই তাঁরা এই অন্যায় কাজ করেছিলেন। পাখির নতুন ঠোঁট উঠলে বা ডানা গজালে যেমন সে ঘন-ঘন যত্রতত্র ঠোক্‌রাতে এবং যেখানে খুশি উড়তে চেষ্টা করে, ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররাও কতকটা তাই করেছিলেন। নতুন প্রগতিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংস্কারমুক্তির আস্বাদ পেয়ে,

প্রথম যৌবনের উদ্দামতায় তাঁরা নিঃসন্দেহে বেশ কিছুটা বেহিসেবী স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তারজন্য কটুবাক্য ও কঠোর সমালোচনা তাঁদের খানিকটা প্রাপ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সমালোচনা ও সামাজিক সমালোচনা দুয়েরই স্বাভাবিক গতি সর্বনাশের দিকে। কোনো সমালোচনাই উপযোগিতা ও উপকারিতার শোভন সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকে না। সমালোচনার ইতিহাসে এটা চিরকালের একটা বড় কলংক।

ডিরোজীয়ানদের সমালোচনার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই কলংক থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তা হতে হলে বিরোধীদের প্রতি যে মমত্ববোধ থাকা উচিত তা তাঁদের ছিল না। প্রবীণ ও নবীন দুই দলই পরস্পবের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। সেইজন্য কোনপক্ষের সমালোচনাই সঙ্গত ও শালীন হত না।

গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনার পর স্বভাবতঃই ডিবোজিওকেন্দ্রিক বিক্ষোভের তরঙ্গ আরও বেশি উত্তাল হয়ে ওঠে। এর কোনো ঘটনাই ডিরোজিওর উস্কানিপ্রসূত নয়, কিন্তু তবু তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঘটনাচক্রে তাঁকেই তখন বহন কবতে হচ্ছিল। ডিবোজিও তাঁর ছাত্রদের কখনও একথা বলেননি যে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতাব নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, অথবা সামাজিক প্রগতিচেতনা এত উগ্র হবে যে সাধারণ বিধিনিষেধ ও বাদবিচাব করা চলবে না। তাই মনেহয়, হিন্দুকলেজ ছাড়াব পব তাঁব ছাত্রবা অত্যধিক উত্তেজনাব বশে ঘটনাস্রোত যেদিকে প্রবাহিত করছিলেন তা তাঁব মনঃপুত ছিল না তরুণদেব অসংযত উচ্ছলতায ডিবোজিও হযত কিছুটা বেদনা ও অস্বস্তিও বোধ করছিলেন। কিন্তু সামাজিক ঘটনাব এগিয়ে চলার একটা নিজস্ব গতি ও ছন্দ থাকে এবং সবসময় তা নায়কের খেয়ালখুশি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না। ১৮৩১-এব এপ্রিলের পর থেকে ঘটনাস্রোত নিজস্ব গতিতেই ডিবোজিওর আয়ত্তেব বাইরে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান নায়ক হলেও পবে তিনি তাব হাল ধবতে পারেননি। কিন্তু তা না পাবলেও তরুণবা তাঁব সান্নিধ্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিতও হযনি। চারিদিকের আবর্তেব মধ্যে তিনিই ছিলেন তাদের প্রেরণার উৎস। হাল ধরার মতো তার বয়স হয়নি, হাতও শক্ত হয়নি।

নিরাশ্রয় হয়েও কৃষ্ণমোহন নিরুৎসাহ হননি। গৃহত্যাগ করার সময় তাঁর

মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন এই ভাষায়: 'We left the home where we passed our infant days; we left our mother that nourished us in our childhood; we left our brother with whom we associated in our earliest days; we left our sisters with whom we sympathised since they were born'. বিচ্ছেদের এই বেদনার সঙ্গে সামাজিক নির্যাতনও তাঁকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধবরা তার খানিকটা অংশ গ্রহণ করলেও, শিক্ষক ডিরোজিওর অপমান ও বেদনার কথা মনে করে সমস্ত নির্যাতনই তরুণদের কাছে উপেক্ষণীয় মনে হয়েছে। নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন তাঁদের মুখপত্র 'এনকয়ারারের' পৃষ্ঠায় তাঁরা জবাব দিয়েছেন এই ভাষায়

> Persecution is high for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied, we are right; we must persevere in our career. If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed. Conspiracies are daily formed to hurt us in every possible way. Circulars stuffed with falsehoods have been issued to defame our character; and all cruelties which the rage of malice and the heat of fanaticism can invent, have been planned to be exercised upon us. But we will stand persecution. A *people* can never be reformed without noise and confusion.

'আমরা হিন্দুধর্মের পবিত্র দেবালয় পরিত্যাগ করেছি বলে আমাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে। কুসংস্কার আমরা বর্জন করেছি বলে অতিধার্মিকরা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। আমরা যা করছি তা ন্যায়সঙ্গত বলেই আমাদের বিবেকবুদ্ধিসম্মত। ধৈর্য ধরে আমরা তা করব প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিরোধীরা যদি ক্রোধে আত্মহারা ও মারমুখী হয়ে ওঠেন, আমরা মৃত্যুও বরণ করতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদের সংগ্রামলব্ধ স্বাধীনতা একতিলও আমরা ছাড়তে ইচ্ছুক নই। আমরা জানি, প্রতিদিন আমাদের আঘাত করার জন্য বিরোধীরা নানারকমের চক্রান্ত করছেন। আমাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধেও মিথ্যা কলংক রটাচ্ছেন তাঁরা প্রচারপত্র বিলি করে। বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতাপ্রসূত যতরকমের নির্দয় অপকৌশল আছে সব তাঁরা একে-একে আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সর্বপ্রকারের অত্যাচার আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত। আমরা জানি, একটা জাতিকে সংস্কারমুক্ত ও উন্নতচিত্ত করতে হলে বাইরে খানিকটা কোলাহল ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবেই।'

ডিরোজিও একদিন তাঁর তরুণ প্রতিভাবান ছাত্রদের ভবিষ্যৎজীবনের কথা মনে করে কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি-কল্পনায় তরুণদের আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দেখছি, সদ্যফোটা ফুলের মতো পাঁপড়ি মেলে তোমাদের প্রতিভার মুকুল ফুটে উঠেছে, মনের কপাট খুলে যাচ্ছে একে-একে, এবং যে মোহর বন্ধনে তোমাদের প্রচণ্ড ধীশক্তি আজ শৃংখলিত তাও ক্রমে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাখির ছানার মতো তোমাদের ডানা-ঝাপটানি শুনছি আমি, আর কান পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে, মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে উধাও হবে তোমরা অনন্ত আকাশের সীমানা-সন্ধানে।'

বাংলার তরুণদের এই শক্তিপরীক্ষা শুরু হল ১৮৩১-এর আগস্ট, সেপ্টেম্বর থেকে। ডিরোজিও মনে-মনে বুঝলেন, সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণকামনায় উদ্‌বুদ্ধ এই তরুণের দল ভুল করবে অনেক, পদে-পদে অন্যায়ও করবে 'এবং সংযম ও শৃংখলার বাঁধও ভাঙবে বারবার। তাদের দীক্ষাগুরু হলেও,'এই দুর্বার অভিযান প্রতিরোধ বা সংযত করার সাধ্য তাঁর নেই। সংগ্রামের জয়-পরাজয় ও ফলাফল সবই অনিশ্চিত, কিন্তু সংগ্রামের সৈনিক যারা, প্রেরণা তাদের অফুরন্ত। মানুষের কল্যাণ, সমাজের উন্নতি, দেশের অগ্রগতি, ব্যক্তির মুক্তি, অজ্ঞানের জ্ঞান, অন্ধের দৃষ্টি, পঙ্গুর চলৎশক্তি, বোবার বাক্‌শক্তি—এইরকম শত-মুখ থেকে উৎসারিত তাদের প্রেরণা। এ-যেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তাই এ-সংগ্রামের হয়তবা শুরু আছে, গতি আছে, কিন্তু শেষ নেই।

৯. মতবিরোধ

কৃষ্ণমোহন ও দক্ষিণারঞ্জনের দল বাইরের সমাজে যখন প্রবল বিতণ্ডার ঝড় তুলছিলেন, তখন ডিরোজিও যে কেবল শান্ত বা উদ্‌বিগ্ন হয়ে দূর থেকে তা দেখছিলেন তা নয়। 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকায় হতভাগ্য ফিরিঙ্গি-সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য তিনিও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ছাত্রদের তুলনায় যৌবনসুলভ উদ্দামতা তাঁরও কিছু কম ছিল না। কৃষ্ণমোহনেব 'এনকয়ারার' পত্রিকার মতো 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনিও তরবারির মতো লেখনী চালনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। ধৈর্য ও সংযম, গুরু বা শিষ্যবৃন্দের কারও বিশেষ ছিল না। উভয়েই সমান একরোখা ও চরমপন্থী ছিলেন।

ব্রাহ্মণের বাড়ি গোমাংস নিক্ষেপ করে কৃষ্ণমোহনের বন্ধুর দল যখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময় ডিরোজিও 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকায় 'জন বুল' পত্রিকার সম্পাদক সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে 'অসংযত ও অশোভন'

মন্তব্য করে, হিন্দুসমাজে না-হলেও, ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গিসমাজে বেশ তোলপাড় তুলেছিলেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ঘটনাটি 'জনবুল' পত্রিকার সম্পাদক ক্যাপ্টেন ম্যাকনাগটেন (Captain Macnagten) নিজের ভাষায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন

I accordingly went to his house (ডিরোজিওর) the following morning, accompanied by a friend, and was shown into an office room where two persons were sitting. I did not know Mr. Derozio by sight, and therefore said that I desired to see the Editor of the East Indian. After some hesitation one of them replied 'I am the Editor'. 'Then' said I 'this note (producing note) is your writing I presume' ? He took it from me, looked at it, fumbled with it a little, and then with increased hesitation said that he had written it. Upon that I took it out of his hand, refolded it, returned it to my pocket, and then said, 'Now, Sir, for the gross insolence of that note, I have come here to inflict upon you a personal chastisement', and then taking him by the collar, I gave him two blows with a light stick, which blows, though intéded foı his shoulders, fell upon his arm that had been raised toward them. They were not of a nature to do him any sort of bodily injury, for I had no desire to do that, nor would the object I had in view have been attained by such an effect. He neither said anything nor offered the slightest resistance while this was going on ; but on the contrary grew as pale as he could, and perceptibly trembled—*Indian Gazette*, 26 September, 1831.

'বুল'-সম্পাদক লিখেছেন : 'পরদিন সকালে একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আমি ডিরোজিওর বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ি যাবার পর আমাকে একটি অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দেখলাম সেখানে দুই ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি ডিরোজিওকে এর আগে কোনদিন চোখে দেখিনি। সেইজন্য ঘরে ঢুকে বললাম, 'ইস্ট ইণ্ডিয়ানের' সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটু ইতস্তত করে একজন বললেন, আমিই সম্পাদক। তারপর আমি বললাম, তাহলে এই লেখাটি (লেখাটি দেখিয়ে) আপনারই আশা করি? আমার হাত থেকে তিনি লেখাটি নিলেন, কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন, আমতা-আমতা করে জড়ানো স্বরে বললেন, হ্যাঁ আমারই লেখা। লেখাটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললাম, এই লেখাতে আপনি যে সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন তা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শাস্তি দিয়ে সংশোধন করার জন্য আমি এসেছি। এই কথা বলে, ডিরোজিওর জামার কলার ধরে একটি হালকা বেত দিয়ে দু'ঘা মারলাম। ইচ্ছে ছিল কাঁধের উপর মারার, কিন্তু হাত তুলে ঠেকাতে যাবার ফলে তাঁর হাতেই বেতের বাড়ি লেগেছিল। সত্যি-সত্যি বেত মেরে তাঁকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাতে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। এই ঘটনার সময় ডিরোজিও কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করেননি। তাঁর চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, এবং ভয়ে তিনি কাঁপছিলেন।'

'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' ডিরোজিওকে বেত্রাঘাত করেছিলেন অবিমিশ্র 'জনবুল' ম্যাকনাগটেন।

কারণ খাস-ইংরেজ ক্যাপটেনের আত্মসম্মানে নাকি বেহুঁসের মতো আঘাত করেছিলেন ফিরিঙ্গি ডিরোজিও। ঘটনাটি নিয়ে ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গি মহলে কয়েকদিন বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ডিরোজিওর তরুণ বাঙালী ছাত্ররাও নিশ্চয় খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিল।

মধ্যে-মধ্যে তরুণদলের সংস্কারপ্রচেষ্টা সমর্থন করে ডিরোজিও 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদিও লিখতেন মনে হয়। অর্থাৎ কেবল ফিরিঙ্গি-সমাজের দিকে নয়, হিন্দুসমাজের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কৃষ্ণমোহনের দল হিন্দুদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির যে কঠোর সমালোচনা করতেন,

একমাত্র ডিরোজিও তার ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বিচার করে আন্তরিক সাধুবাদ জানাতেন পত্রিকা মারফৎ। হিন্দু মডারেটরা, অর্থাৎ মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মরা নীতিগতভাবে পৌত্তলিকতা বর্জন করেও স্বগৃহে ও পরিবারে ঠিক পৌত্তলিকের মতোই আচরণ করতেন। তরুণ প্রগতিপন্থীদের কাছে স্বভাবতঃই এ আচারণ বিসদৃশ ঠেকত। মডারেটদের অগ্রগণ্য, ব্রাহ্মদের, অন্যতম নেতা 'রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে এই আচরণের অপরাধে তরুণবা একবার 'এনকয়ারার' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রথমে দুর্গোৎসবের বিবরণ প্রসঙ্গে যাঁবা প্রতিমা-পূজাবিরোধী অথচ দুর্গাপূজা করছেন তাঁদের নামের তালিকা প্রচার করেন। কিছু টিপ্পনীও ছিল তার সঙ্গে। দুই নৌকায় পা দিয়ে এইভাবে যাঁরা এগিয়ে চলতে চান, কথার সঙ্গে কাজের এবং নীতির সঙ্গে আচার-ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষা করার প্রয়োজনবোধ করেন না, তরুণের দল তাঁদের নির্মমভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন। প্রসঙ্গটি নিয়ে ডিরোজিও তাঁর 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকাতেও আলোচনা করেন এবং তরুণদের সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত বলে সমর্থন করে প্রসন্নকুমারের দুর্বল দু'মুখো মনোভাব নিন্দনীয় বলে প্রচার করেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' সংবাদে প্রকাশ

> The East Indian then took up the subject, and in allusion to Baboo Prasanna Kumar's connection with the *Reformer*, a paper in which the Hindoo Gods and Goddesses are treated with little honor, maintained the inconsistency of his engaging in this festival. Some friend of the Baboo's then came forward and addressed a letter to the *India Gazette*, in which he endeavoured to exculpate him, by asserting that he was bound to perform the worship of the Goddess, in as much as he had trust property in his hands which had been devoted to the subject To this a rejionder was given in the *East Indian* denying the fact.—*Indian Gazette*, November 1, 1831.

প্রসন্নকুমারের বন্ধুর যে চিঠির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'The East Indian and Baboo Prusunnu Coomar Tagore' নামে সেই চিঠিখানি ১৮৩১, ১৯ অক্টোবর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়। প্রসন্নকুমার তাঁর 'রিফর্মার' পত্রিকায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখেন অথচ নিজে প্রতিমাপূজা করেন বলে ডিরোজিও ও কৃষ্ণমোহনের দলের অভিযোগের উত্তরে বন্ধুটি লেখেন

> He has attacked idolatory because he hates it from the bottom of his heart. I know he hates it as much as Mr. Derozio, the Editor of East Indian, or Baboo Krishnamohan Banerjee, the Editor of the Enquirer, can do.

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রসন্নকুমার কেন দুর্গাপূজা করেন সে সম্বন্ধে বন্ধুটি লিখেছেন, তিনি সমর্থন করেন বলে যে পূজা করেন তা নয়, পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য করতে বাধ্য হন। এই কথা বলে তিনি প্রশ্ন করেছেন

> May I ask Mr. Derozio if he never saw a rank Deist going to the Temple of Christ, and worshipping at his altar without a grain of belief in the Bible ? I think he should constantly expose their conduct as being more within the bounds of his vocation, than trouble himself about what Hindoos do—a subject on which notwithstanding his pretensions he has often betrayed great ignorance.

ডিরোজিওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যেখানে, সমালোচক ঠিক সেখানেই আঘাত করেছেন। অর্থাৎ ডিরোজিও যে ফিরিঙ্গি এবং হিন্দুদের সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা করার অধিকার তাঁর নেই, এই কথাই তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইয়োরোপীয় ডীয়িস্টরা বাইবেলের অলৌকিকতায় বিশ্বাস না-করেও গির্জায় উপাসনা করতে যান কি-না, সেবিষয়ে আলোচনা করার অধিকার ডিরোজিওর আছে, কিন্তু হিন্দুরা পূজা করবেন কি করবেন না, অথবা করলে কি পদ্ধতিতে করবেন, সে-সব বিষয় তাঁর আলোচনাভুক্ত

নয়, যেহেতু তিনি হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

অবশ্য ডিরোজিও তাঁর দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর তরুণ হিন্দু ছাত্রদের সংস্কার-আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপদেষ্টা ও উৎসাহদাতা হয়েই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তবু মধ্যে-মধ্যে তরুণদের কর্ণধারহীন অসহায় অভিযানের কথা ভেবে, এবং বয়সে নিজেও একজন তরুণ হয়ে, তিনি তাঁদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের নৈতিক সমর্থনে দু'চার কথা প্রকাশ্যে না-বলে স্থির থাকতে পারেননি। যখনই বলেছেন তখনই গোঁড়া হিন্দুরা তো বটেই, 'মডারেট' বা উদার সংস্কারপন্থীরাও তাঁর জাতিগত অধিকার সম্বন্ধে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন। প্রকাশ্যে হিন্দুসমাজ সম্পর্কে কোনো কথা বলার অধিকার বা সুযোগ ছিল না তাঁর। এই অধিকারের গণ্ডি লংঘন করেই তাঁকে মধ্যে-মধ্যে তরুণদের পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছে, কারণ বাংলার তরুণরা তখন তাঁরই কাছ থেকে পথচলার প্রেরণা প্রত্যাশা করেছেন সবচেয়ে বেশি।

ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি ও তাঁর অনুগত তরুণদের প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার পর, কলকাতার সাহেব-সমাজে তাঁর প্রভাব ও সমাদর বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল মনে হয়। উনিশ শতকের তিরিশে পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশের সামাজিক প্রথা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে সাহস করতেন না। সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও তাঁদের শাসননীতিসম্মত ছিল না। তাই ডিরোজিও ও হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে হিন্দুসমাজে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তাতে তাঁরা আলোচনা-সমালোচনার ও মতামত প্রকাশের ব্যাপারে অত্যধিক সাবধান ও খানিকটা ভীতও হয়ে উঠেছিলেন। ডিরোজীয়ানদের মতামত সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও তা তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে করেননি বা করতে পারেননি। 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা', 'ক্যালকাটা গেজেট', প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ শিষ্যবৃন্দের কার্যকলাপের সমালোচনার ভঙ্গি ও সুর দেখলেই তা বোঝা যায়।

১৮৩১-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েকমাস ধরে 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা', প্রসন্নকুমারের 'রিফর্মার', ডিরোজিওর 'ইস্ট

ইণ্ডিয়ান' ও কৃষ্ণমোহনের 'এনকয়ারার'—এই পাঁচখানি ইংরেজি পত্রিকায়, 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার দর্পণ' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'— এই চারখানি বাংলা পত্রিকায় এই-সময়কার সামাজিক আন্দোলনের ধারা ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারকমের আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। এই আলোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনটি প্রধান মতামতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল তখন—ক. বামপন্থী, খ. উদারপন্থী ও গ. রক্ষণশীল। এই মতামতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পত্রিকাগুলি এইভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল

বামপন্থী	উদারপন্থী	রক্ষণশীল
এনকয়ারার	ইণ্ডিয়া গেজেট	সমাচর চন্দ্রিকা
ইস্ট ইণ্ডিয়ান	বেঙ্গল হরকরা	সংবাদ প্রভাকর
জ্ঞানান্বেষণ	রিফর্মার	
	সমাচার দর্পণ	

বামপন্থীরাই এর মধ্যে বয়সে সবচেয়ে তরুণ ছিলেন। প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বয়স তখন আঠার-উনিশ, এবং ডিরোজীয়ানদের হিন্দুধর্মবিদ্বেষের উগ্রতার আবর্তে পড়ে তিনি তাঁদের নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি ঠিক 'ধর্মসভা' বা চন্দ্রিকার অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। সমালোচনা তাঁর ব্যঙ্গপ্রীতির আকর্ষণে মধ্যে-মধ্যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করলেও, চন্দ্রিকার ঠিক প্রতিধ্বনি তিনি করেননি। তবু মতামতের শ্রেণীবিভাগ করতে হলে এইসময়ের প্রভাকরকে রক্ষণশীল দলের সঙ্গী ছাড়া কিছু বলা যায় না। 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পত্রিকা, তরুণ ডিরোজীয়ানদের হিন্দুধর্মবিবোধিতায় তাঁদের উল্লসিত হবার কথা। তাই তাঁরা হয়েছিলেনও। এই কারণে তরুণ সংস্কারকদের খানিকটা তাঁরা সমর্থন না-করে পারেননি। কিন্তু নাস্তিকতা বা ধর্মভাবের অভাব তখন হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যেরকম প্রবল ছিল, তাতে মিশনারীদের প্রীত হবার কথা নয়। কোনো মিশনারীর দল তা হননি, কেরী-মার্শম্যানের দলও না, ডাফের দলও না। 'সমাচার দর্পণের' সমর্থন বা উল্লাস সত্ত্বেও তাই তাকে 'উদারপন্থী' ছাড়া কোনো আখ্যা দেওয়া যায় না।

সত্যকার মধ্যপন্থী বা উদারমতাবলম্বী ছিলেন 'রিফর্মার' এবং তার বড়

সমর্থক ছিলেন ইণ্ডিয়া গেজেট ও হরকরার ইংরেজ সম্পাদকরা। 'গেজেট' ও 'হরকরা' এইসময় উঠেপড়ে লেগেছিলেন তরুণদের সংযত করার জন্য। ধারাবাহিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তরুণদের কার্যকলাপ, রীতিনীতি, মতামত ইত্যাদি সমালোচনা করে তাঁরা কেবল তাঁদের গরম না হয়ে নরম হতে উপদেশ দিতেন। অবশ্য কোনো বিদ্বেষভাব নিয়ে 'destructive' সমালোচনা তাঁরা বিশেষ করতেন না, সাধারণত সহানুভূতি প্রকাশ করে 'constructive' সমালোচনাই করতেন। যেমন 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন

> Here as well as elsewhere there is a conflict going on between light and darkness, truth and error, and it is because we cannot fully approve of the temper and proceedings of those who have our best wishes that we now advert the subject, in the hopes of leading them to a more correct appreciation of the circumstance in which they are placed, and to the adoption of better adapted means for the promotion of their object.
>
> —*India Gazette*, Editorial, October 21, 1831.

তারপর যুক্তির জাল বিস্তার করে তরুণদের দেখানো হয়েছে, তাঁদের ভুলভ্রান্তি কোথায়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র যুক্তি এই: রামমোহনের অনুগামী ব্রহ্ম-সভাপন্থীরা হলেন হিন্দুসমাজের মডারেটগোষ্ঠী, আর 'ডিরোজিওর অবাধ চিন্তার অনুগামীরা হলেন 'ultra left' বা 'রেডিক্যাল পার্টি'। দুই দলই সমাজের সংস্কার, উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করেন এবং চিরকালের শাস্ত্রবচনের চেয়ে যুক্তি ও বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করতে চান। উভয় দলই পৌত্তলিকতা যুক্তিহীন ও অর্থহীন কুসংস্কার বলে বর্জন করতে চান, জাতিভেদ অমানবিক সামাজিক প্রথা বলে মানতে চান না এবং যে-কোনো বিষয়ে ধর্মান্ধতাকে ঘৃণা করেন। কিন্তু মডারেটরা ধীরে সুস্থে সংস্কারের পথে এগুতে চান। তাঁরা মনে করেন, একটা সুপ্রাচীন সমাজের নীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ধ্যান-ধারণা হঠাৎ ইচ্ছা করলেই বদলে ফেলা যায় না। তাছাড়া, সমাজের জনমতকে উপেক্ষা করে বা আঘাত দিয়েও কোনো প্রথা বা সংস্কার বা

অনুষ্ঠান উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলে বিপরীত ফল ফলতে পারে। তাতে সংস্কার-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করাব সম্ভাবনাই বেশি। মডারেটদের এই মন্থরনীতি যুক্তিসম্মত। চরমপন্থী রেডিক্যালরা একথা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের উগ্রতা ও অস্থিরতা এত প্রবল যে সহযোগী বা 'fellowtraveller' মডারেটদের ব্যক্তিগতভাবে নাম ধরে-ধরে সমালোচনা করে ক্রমেই তাঁরা তাঁদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সকল দলের সংস্কারকামীদের 'united front' প্রয়োজন গোঁড়া রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। বামপন্থীদের এই ঐক্য ও পারস্পরিক সহনশীলতা না থাকলে তাঁদের কোনো দলেরই উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে তরুণ প্রগতিপন্থীরা যদি তাদের লেখায় ও আচরণে আরও সংযম ও ধৈর্য প্রকাশ করতে না পারেন তাহলে সংস্কার সাধনের সমস্ত উদ্যম তাঁদেব ব্যর্থ হবে।

'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র এই যুক্তি সমর্থন করে 'বেঙ্গল হরকরা' লেখেন

> We agree with our contemporary of the India Gazette that some of the Hindoo Reformers in their abhorrence of, superstitions have been in some instances carried away by the violence of their feelings into foolish extravagances and very idle bravadoes.

'রিফর্মার' পত্রিকাও তাঁদের কর্মনীতি ব্যাখ্যা করে তরুণ বামপন্থীদের অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। তরুণরা মডারেটদের বলতেন 'half-liberals', এবং মডারেটরা তরুণদের বলতেন 'ultra-radicals', কিন্তু সাধারণের কাছে তাঁরা শুধু মডারেট ও 'রেডিক্যাল' বলে পরিচিত ছিলেন। উভয় দলের বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে 'হরকরা' লেখেন

> 'The merits of the two sects have excited some rather angry and irritating discussions, which while they can do no good to either party may seriously injure the cause which both equally profess to have at heart, and only adopt different means for the attainment of the same end'. (২৬ অক্টোবর ১৮৩১, 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' উদ্ধৃত)

'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'হরকরা', 'রিফর্মার' প্রভৃতি বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের উপদেশ-নির্দেশ তরুণরা যে ঘাড় হেঁট করে মেনে নিতেন তা নয়। তাঁদের মন্থরগতি নরমনীতির সমালোচনা করে, প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করে, তাঁরা জবাব দিতেন। 'এনকয়ারার' পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ রেডিক্যালদের একটি দীর্ঘ জবাব ২৯ অক্টোবর (১৮৩১) 'ইণ্ডিয়া গেজেট' মুদ্রিত হয়। তরুণরা লেখেন যে বয়স্ক ও প্রবীণ প্রাজ্ঞদের যুক্তি দিয়ে বা বুঝিয়ে তাঁরা দলভুক্ত করতে পারবেন বলে আশা করেন না। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ও 'হরকরা' মনে করেন যে মডারেটদের কটু সমালোচনা করে তরুণরা ক্রমে তাঁদের রক্ষণশীলদের দলে ঠেলে দিচ্ছেন, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। বরং তরুণদের নীতি ও কার্য-কলাপের কঠোর সমালোচনা করে এবং রক্ষণশীলদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নানারকমের কুৎসা রটিয়ে মডারেটরাই তাঁদের সংস্কার-আন্দোলনে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন।

রক্ষণশীল ও মডারেটদের বিত্ত বা প্রতিপত্তির কোনো অভাব নেই, ইচ্ছা করলে তাঁরা সহায়সম্বলহীন তরুণদের সবদিক দিয়ে পিষে মেরে ফেলে দিতে পারেন। কুৎসা রটানোর সুবিধা তাঁদের অনেক, এবং তাঁদের পত্রিকার প্রচার বেশি বলে হিন্দুসমাজের বৃহৎ অংশের কাছে তরুণদের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিতেও কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং মডারেটদের তরুণরা বিচ্ছিন্ন করছেন না, বরং তরুণদের তাঁরাই উৎসন্ন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তাছাড়া মডারেটদের মন্থরগতি সংস্কারনীতির মূলেই এমন গলদ রয়েছে যে তাঁদের উপর কোনদিক থেকেই ভরসা করা যায় না। তাঁরা কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে চলেন, যখন যেদিকে সুবিধা। নীতি বা আদর্শ বলে বিশেষ কিছু তাঁদের নেই। কথা ও কাজের সঙ্গে তাঁদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। সম্পত্তি, টাকাকড়ি, জাতি প্রভৃতি এত রকমের স্বার্থের সঙ্গে তাঁরা জড়িত যে সামাজিক সংস্কারকর্মে নির্ভয়ে আত্মনিয়োগ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। যুগের হাওয়া বদলেছে বলে প্রগতির কথা তাঁরা মুখে আওড়ান, কেবল তার মানটুকু সমাজের কাছ থেকে বিনা মাশুলে আদায় করার জন্য। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়াতে হয় তখনই ভয়ে তাঁদের বুক কাঁপতে থাকে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে এবং স্বার্থের কালো হাওয়া নীতির ক্ষীণ দীপশিখাটিকে ফুৎকারে

নিভিয়ে দেয়। এই তো হিন্দুসমাজের স্থির ধীর মডারেটদের অবস্থা। এ-হেন মডারেটদের সঙ্গে হাত মেলাবার চেষ্টা করে লাভ কি? এরকম ডাইনে-বাঁয়ে দোলায়মান সহযাত্রী কি পথ চলতে সাহায্য করে, না বাধারই সৃষ্টি করে বেশি, তরুণ রেডিক্যালরা তাই লিখেছেন, 'We disregard all that they say or do, and are *engaged in measuring our success with the rising generation*. 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদককে লক্ষ্য করে 'এনকয়ারার' লিখলেন, 'We hope he will not forget that our object is to influence our younger friends with a liberal example, and that we never entertained the elder members of the orthodox community.' প্রসঙ্গত গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এই ঘটনাটির কথা বারংবার উত্থাপন করে তরুণদের অপদস্থ করার চেষ্টা করেন বলে 'এনকয়ারার' লিখেছেন

> Our contemporary has adverted to the throwing of the meat in the house of an orthodox Hindoo—a circumstance which the perpetrators confessed was wrong, and which no generous mind would after our confession of repentance, and assurance of strict conduct—think of referring to. It is true that the feelings of the bigots have been improperly wounded; we have perceived our guilt and have corrected ourself. Is i then consistent with one that 'wishes us well'—nay, whose 'warmest wishes' we have the happiness to be entitled to—to rake up faults which we have confessed ourselves guilty of, and which perhaps the most implacable foe would have the generosity to excuse?

'কিছুদিন আগে একজন গোঁড়া-হিন্দুর বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনাটি ইণ্ডিয়া গেজেট-সম্পাদক পুনরুল্লেখ করেছেন তরুণদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। কিন্তু তরুণরা যখন কাজটি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বলে

স্বীকার করেছেন, অনুতাপ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আর এরকম অন্যায় আচরণের পুনরাবৃত্তি হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তখন আমাদের সহযোগীর উচিত হয়নি তরুণদের গায়ে কাদা ছেটাবার জন্য বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করা। অন্যায়ভাবে আমরা গোঁড়াদের আঘাত দিয়েছি একথা ঠিক। কিন্তু আমবা আমাদেব ভুল স্বীকার করে নিজেদের যে সংশোধন করেছি, সেকথাও ঠিক। অতএব তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাব অর্থ হল কুৎসিত মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া। গেজেট কথায়-কথায় আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে পরিচয় দেন, শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করেন, তাই তাঁদের একথা বলা প্রয়োজন। শত্রুবাও শুনেছি দোষ স্বীকার করলে ক্ষমা করেন, কিন্তু সহযোগী গেজেট আমাদেব মিত্র হয়েও এটুকু উদারতা দেখাতে পারেননি।'

মতামতেব এই সংঘাত ১৮৩১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে, তারপর তার তীব্রতা ধীরে-ধীরে কমে যায়। কিন্তু ১৮৩২ সালের সঙ্গে আপাততঁ আমাদের সম্পর্ক নেই, কারণ ডিরোজিও তার কয়েকদিন আগেই সংগ্রামক্ষেত্র থেকে তো বটেই, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ১৮৩২ সালে ও তার পরে সংগ্রামের সমস্ত দায়িত্ব বহন করে এবং তার প্রচণ্ড ঝড়ঝাপ্‌টা সহ্য করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর তরুণ মন্ত্রশিষ্যরা। ১৮৩১ সালই ডিরোজিওর জীবনের শেষ বৎসর। ২৫ এপ্রিল তাঁব পদচ্যুতিব পব থেকে, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বব পযন্ত—রক্ষণশীল, মডারেট ও তরুণ রেডিক্যাল দলের পত্রপত্রিকায় মতামতের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। এর মধ্যে ডিরোজিও নিজে একবার 'John Bull'-এর গায়ে খোঁচা দিয়ে তার শিঙের গুঁতোও সহ্য করেন। তাঁর তরুণ ছাত্রদলও রক্ষণশীল ও মডারেট উভয়গোষ্ঠীর নির্মম বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হতে থাকেন। মতামতের এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ১৮৩১ সাল, এবং ডিরোজিওর জীবন, ক্রমে শেষ হয়ে যায়।

১০. উল্কাপাত

ডিরোজিও কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তির পূর্ণবিকাশের আগে তাঁর মৃত্যু হল। আঠার বছর বয়সে তাঁর যে প্রথম কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় তিনি লেখেন*

> Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he ventures to present himself as a candidate for public fame; and begs leave to premise, that only a few hours gained from laborious daily occupations have been devoted to these poctical efforts.

ভারতবর্ষে জন্ম ও শিক্ষালাভ করে আঠার বছর বয়সেই ডিরোজিও সমাজের কাছে কবিখ্যাতি দাবি করেছিলেন। বাইশ বছর বয়সের মধ্যেই এই দাবি পূরণের জন্য যা-কিছু প্রচেষ্টা তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাও সর্বক্ষণ

* Poems: by H. L. V. Derozio. Printed for the author by the Baptist Mission Press, Calcutta, 1827.

তাঁর প্রাণমন যে তিনি কাব্যচর্চায় নিয়োগ করতে পেরেছিলেন তা নয়। দৈনন্দিন শ্রমসাধ্য কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে সামান্য যেটুকু কাব্যচর্চা করার সময় পেযেছিলেন তিনি, তারই ফল হল তাঁর কাব্যসংকলনের কবিতাগুলি।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁব কাব্যসংকলন মুদ্রিত হবার আগে তিনি 'as a candidate for poetic fame' আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা লিটাবারি গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ইয়োরোপীয় মহলে এবং তাঁর ইংরেজিশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে তাঁর কাব্যশক্তির কলগুঞ্জন তখনই শোনা গিযেছিল। তাঁব প্রথম কাব্যগ্রন্থ লণ্ডনের প্রেসেও প্রশংসালাভ করেছিল শোনা যায় ('ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯ ডিসেম্বব ১৮৩১)। 'ক্যালকাটা গেজেট' লিখেছেন: 'They evinced a vigour of thought, and originality of conception, a play of fancy, and a delicacy of tone, which occasioned the more surprise when the reader came to know that the author was an East Indian boy, whose peregrinations had never extended beyond limits of Bengal '

বাংলা দেশে ফিবিঙ্গিসমাজে জন্মগ্রহণ কবে, তাব ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে জীবন কাটিযে, কিশোর বয়সে এই কবিতা বচনা কবা নিশ্চয় কাব্যশক্তির পবিচাযক। কিন্তু অনুভূতিব সঙ্গে অভিজ্ঞতাব এমন সংমিশ্রণ ডিবোজিওর জীবনেব স্বল্পপবিসবে সম্ভব হযনি যাতে তাঁর প্রত্যয় ও কল্পনায মৌলিকতার স্বাক্ষব ফুটে উঠতে পাবে। বস্তুত সেরকম স্বাক্ষব তাঁব কবিতায় বিশেষ নেই। 'জঙ্গীবাব ফকিব' কবিতা এবং সংকলনেব ছোট-ছোট কবিতার মধ্যে সেযুগেব ইংবেজ বোমান্টিক কবিদেব প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, বিশেষ করে স্কট ও বাযরনেব। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শিশুসুলভ অনুকবণ বলে মনে হয়। কিন্তু বযসেব দিক থেকে তাঁব এ-ক্রটী মার্জনীয়, এবং একথাও স্বীকার্য যে কৈশোবেই ডিবোজিও বিস্ময়কর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কবিখ্যাতির দাবিও কিছুটা পূর্ণ হয়েছিল, যদিও সর্বকালের মতো সেকালেও তাঁর কবিতাব নিন্দুকের অভাব ছিল না। কেউ-কেউ বলেছেন যে ডিবোজিও আরও অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখতে পারতেন যদি বন্ধুবান্ধব ও স্তাবকদের 'flattery' ও 'sugar-plums' তাঁর কচি মাথাটিকে বিগড়ে

না দিত। কেউ বলেছেন, তাঁর কবিতায় 'oriental images'-এর ঝলমলানি এবং 'smart conceits'-এর কৌশল ছাড়া আর কিছু নেই।*

শোনা যায়, কবি হিসেবে ডিরোজিওর খ্যাতি হবার পর তাঁর অহমিকা ব্যক্তিগত আচারে-ব্যবহারে পর্যন্ত নাকি বেশ উগ্রভাবে প্রকাশ পেত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি নিজেকে একজন ক্ষণজন্মা 'প্রতিভা' বলে মনে করতেন এবং নিজের মতামতকে সবসময় সকলের উপরে শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন। তাঁর এই দম্ভের জন্য অনেকে তাঁকে পছন্দ করতেন না, এমনকি তাঁর ন্যায্য কবিসম্মানটুকুও দিতে কুণ্ঠিত হতেন। একদিন ডিরোজিও এক বন্ধুর বাড়িতে বোধহয় সাহিত্যের আড্ডায় যোগ দিতে যান। বাড়ি পৌঁছে ঘরের ভিতর থেকে তাঁর নামে আলোচনা শুনতে পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। ঘরের মধ্যে তাঁরই কবিতা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। কে-একজন বলছিলেন, 'as for Derozio, I allow he possesses fancy, but my Khansamah possesses more judgement than he'. এই কথা শোনার পর ডিরোজিও সেই বন্ধুর বাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন, তারপর আর কখনও তাঁর বাড়িমুখো হননি।

বিদ্বেষকাণা নিন্দুকদের এই নিন্দা অথবা গুণমুগ্ধ স্তাবকদের অতিপ্রশংসা, কোনটাই কবি হিসেবে ডিরোজিওর প্রাপ্য নয়। তবে অতি অল্পবয়সে কবিখ্যাতির জন্য সেকালের দিনে তিনি যদি দাম্ভিক হয়ে থাকেন তাহলে তা মার্জনীয়। প্রথম যৌবনের চাপল্য ও উদারতা তাঁর কর্মক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি প্রকাশ পেয়েছিল। ডিরোজিও নিজেও 'the imperfections of his little work'—তাঁর কবিতাবলীর দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সব ত্রুটি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও, যেটুকু সম্মান ও স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে তিনি দাবি করতে পারেন তাহল—নবযুগের নবচেতনার প্রথম ভারতীয় কবির সম্মান।

ডিরোজিওর আগে আর কোনো ভারত-সন্তান, মাতৃভাষায় বা ইংরেজি-ভাষায়, নবযুগের কল্পনা ও চিন্তা কাব্যে প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। যদি অন্য কেউ তা করে থাকেন (১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের আগে) তাহলেও নবযুগের প্রথমপর্বের কবিদের মধ্যে আমাদের দেশে ডিরোজিও অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত

* পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

হবেন। এইটুকু স্বীকৃতিতেই তাঁর ঋণ শোধ হবে না। ব্রিটিশযুগে পরাধীন ভারতবর্ষে, কোম্পানির আমলও শেষ হয়নি যখন, কিশোর-কবি ডিরোজিও তখন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন ও গান রচনা করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের বেদনা ও কামনা তারই কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে সর্বপ্রথম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কেবল এই কারণেও ডিরোজিও এদেশের ইতিহাসে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন দাবি করতে পারেন।

তাঁর কবিতার একটা প্রধান সুর হল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির আবেদন। 'The Harp of India,' 'Freedom to the Slave', 'Thermopylae,' 'To India, My Native Land' প্রভৃতি কবিতায় এই সুর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।* Harp of my country, let me strike the strain!' অথবা থার্মোপলির কবিতার

> Why they fought, and why they fell ?
> 'Twas to be free !
>
> How liberty in death is won,
> What deeds with Freedom's sword are done
> In freemen's hands !
> They fought for free and hallowed graves
> They scorned to breathe the breath of slaves

অথবা ক্রীতদাসের মুক্তি কবিতায়

> How felt he when he first was told
> A slave he ceased to be, ...

* ডিরোজিওর নিজের সংকলনে 'The Harp of India' প্রথম কবিতারূপে স্থান পেয়েছে ব্র্যাডলে-বার্ট সম্পাদিত ডিরোজিওর কাব্যসংকলনে (*Poems of Henry Louis Vivian Derozio—A Forgotten Anglo Indian Poet*, Oxford University Press 1923) এই কবিতাটির পরে 'To India, My Native Land' কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে। ব্র্যাডলে-বার্ট তাঁর সংকলনের ভূমিকায় ডিরোজিওর কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করেননি। তাঁর সংকলন থেকে ডিরোজিওর নিজের সংকলনের কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে।

He knelt no more ; his thoughts were raised,
He felt himself a man.

Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And feeling for degraded man
Gives freedom to the slave.

মানবপ্রধান বা 'হিউম্যানিস্ট' নবযুগের এই মানবমুক্তির বাণী এর আগে কখনও কোনো ভারত-কবির কাব্যবীণায় এমন সুরে ঝংকৃত হয়ে ওঠেনি। তাঁর 'হে ভারত! স্বদেশ আমার' কবিতার মধ্যেও পরাধীনতার এই গভীর বেদনার সুর গুমরে উঠেছে

'স্বদেশ আমার, কিংবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হয়ে সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তবু শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।'†

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ

কাব্যিক মাধুর্য ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে উচ্চাঙ্গের কবিতা এগুলিকে নিশ্চয় বলা যায় না। ডিরোজিওর অধিকাংশ কবিতাতেই প্রকাশ

† মূল কবিতাটি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পেয়েছে যৌবন-সুলভ ক্ষিপ্রতা ও অস্থিবতা। জীবনেব অভিজ্ঞতার মূলধনও তাঁব এত অল্প ছিল যে প্রধানত শিক্ষালব্ধ ভাবধারা থেকেই তাঁকে কাব্যেব প্রেবণা ও উপাদান দুই-ই সংগ্রহ কবতে হযেছে। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির একাত্মতাব ফলে কবিতায় যে অনবদ্য লাবণ্য ফুঠে ওঠে, তা তাঁব কবিতায বিশেষ ফুটে ওঠেনি। তবু তাঁর কাব্যেব বিষযবৈচিত্র্য ও কল্পনাব ঐশ্বর্য দেখে মনে হয, আবও কিছুকাল বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁব কাব্যপ্রতিভার আবও সুপবিণত প্রকাশ হতে পাবত।

১৮৩১, ২৩ ডিসেম্বব কয়েকদিনেব অসুখে ডিবোজিওর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন বাইশ বছব আট মাস।

অসুখেব সময তরুণ ছাত্রবা তাঁব বোগশয্যাব পাশে বসে সেবাশুশ্রূষা কবতেন। মৃত্যুব আগেব মুহূর্ত পযন্ত নাকি তাঁব অনুসন্ধানী মনেব আকুলতা এতটুকু কমেনি। তরুণদলেব অন্যতম মুখপাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তাঁব কাছে ছিলেন। ডক্টব টাইটলাব, ডক্টব উইলসন, ডক্টব গ্র্যাণ্ট, ডেভিড হেয়াব এবং তাঁর গুণমুগ্ধ আবও অনেক ব্যক্তি তাঁকে দেখতে যেতেন, এবং বোগশয্যাতেও নানাবিষযে তাঁব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাব চেষ্টা কবতেন। শোনা যায়, পাদ্রি হিল (যাঁব বক্তৃতাব পবে **'The whole town was literally in an uproar'**) তাঁব সঙ্গে অসুখেব সময় সাক্ষাৎ কবে খ্রীস্টধর্ম বিষযে তাঁব মতামত জানতে চেযেছিলেন। মহেশচন্দ্র বলেন, মৃত্যুব আগেব মুহূর্ত পযন্ত ডিবোজিও নিজেকে 'খ্রীস্টান' বলে স্বীকাব কবেননি। এ-বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলে তিনি বলেন, 'ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চূডান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানি না। আমাব অনুসন্ধান শেষ হযনি এখনও।' মহেশচন্দ্রেব উক্তি এ-বিষযে মিথ্যা না হবারই সম্ভাবনা, কাবণ ডিরোজিওব ছাত্রদেব মধ্যে কৃষ্ণমোহনেব আগে মহেশচন্দ্রই খ্রীস্টান হয়েছিলেন। ডিবোজিও নিজেকে খ্রীস্টান বলে স্বীকাব করে গেছেন, একথা জানলে তিনি নিশ্চয় খুশি হয়ে তা প্রচাব কবতেন।

ডিবোজিওর মৃত্যুব পব *Indian Register* পত্রিকা তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে লেখেন: **'That he did not view Christianity as a communication from the divinity to fallen man is well-known;**

but it is perhaps impossible to say in what manner he came to fall into such an opinion. (*Calcutta Gazette*, February 13, 1832). খ্রীস্টধর্মের নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁর ঈশ্বর মাহাত্ম্য বা অলৌকিকতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কেবল খ্রীস্টধর্ম নয়, সব ধর্মের প্রতি তাঁর এই একই মনোভাব ছিল। ধর্মের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও অলৌকিক ব্যাখ্যান যুক্তি দিয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। তাই ডিরোজিওকে ঠিক খ্রীস্টধর্মী না বলে, মানবধর্মী বলাই বোধহয় সঙ্গত। রামমোহনের পরে এবং বিদ্যাসাগরের আগে এদেশে নবযুগের হিউম্যানিস্ট চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন ডিরোজিও।*

কলকাতা শহরে দক্ষিণ-পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির সমাধি আছে। ডিরোজিও এই গোরস্থানেই সমাধিস্থ। তাঁর কীর্তির কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। আজ তাঁর সমাধি খুঁজে বার করাও কঠিন। গোরস্থানের পশ্চিমসীমায় এককোণে জনৈক মেজর মেলিঙের সমাধির পাশে ডিরোজিওর কবর। তাঁর মৃত্যুর পরে আনুমানিক আটশত টাকা চাঁদা উঠেছিল স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের জন্য। কিন্তু সেই টাকার তহবিল পরে কোথায় যে উধাও হয়ে যায় কেউ তা জানতে পারেননি। †

গোরস্থানে ডিরোজিওর স্মৃতিচিহ্ন না থাকলেও, বাংলার তরুণদের মানসলোকে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

মহানগরীর কোলাহলময় রাজপথের পাশে হয়ত তাঁর কবিচিত্ত সমাধি কামনা করেনি। স্বরচিত এই কবিতাটিতে হয়ত তাঁর যোগ্য সমাধির বাসনাই তিনি ব্যক্ত করেছেন

Be it beside the ocean's foamy surge,
On an untrodden, solitary shore,

---

* বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। নবযুগের humanism' ও মধ্যযুগের 'humanitarianism'-এর প্রভেদ অনেক। কবি এলিয়টের ভাষায় বলা যায়: '.. the humanitarian has suppressed the properly human, and it left with the animal ; the humanist has suppressed the divine and is left with a human element ... ' (T. S. Eliot, *Selected Essays*, p. 435)

† পরিশিষ্ট—'গ' দ্রষ্টব্য।

Where the wind sings an everlasting dirge,
And the wild wave, in its tremendous roar
Sweeps o'er the sod !—There let his ashes lie
Cold and unmourned—

ডিরোজিওর হঠাৎ-মৃত্যুতে তরুণরা বিচলিত ও বিষণ্ণ হলেও, হতাশ হননি। দ্বিগুণ উদ্যমে তাঁরা আদর্শের সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য এতদিন ইয়োরোপীয়দের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছিল, এখন আর তা থাকবার প্রয়োজন নেই। হিন্দুকলেজের কৃতবিদ্য ছাত্ররা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে নিজেরাই ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হয়ে উঠলেন। নবযুগের জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করার গুরুদায়িত্ব তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করলেন। তরুণদের মুখপত্র 'এনকয়ারার' লিখলেন

The spirit of liberalism has been widely diffused, and that the march of intellect will now be retorted, is far from probable....The rays that have emanated from the Hindoo College and that are now diverging to other places, must eventually dissipate the mists of ignorance and superstition ... The liberal, although now persecuted by the brutal tyranny of priestcraft, will soon have occasion to seal his triumph in the overthrow of the ignorance—*India Gazette*, '6 September 1831—সংখ্যায় উদ্‌ধৃত।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তরুণদের ভবিষ্যৎজীবনের এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ডিরোজিও লিখেছিলেন

Expanding, like the petals of young flowers ;
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young bird in soft summer hours)
Their wings to try their strength. O how that winds

Of circumstances, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship Truth's omnipotence !

What joyance rains upon me, when I see
Fame, in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you are yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

(The Bengal Annual, 1831)

ডিরোজিওর মৃত্যুকালে বাংলার তরুণরা মুক্ত-বিহঙ্গের মতো ডানা মেলছিলেন 'to try their strength', শক্তি পরীক্ষার জন্য। তরুণদের উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে নবযুগের মুক্ত-জীবনের এক বলিষ্ঠ কল্পনা কায়া ধারণ করেছিল ধীরে ধীরে। অবাধ চিন্তা, সত্য সুন্দর ও সবল নীতির যাত্রাপথে তাঁরা বহু বাধাবিঘ্ন আশংকা করছিলেন বটে, কিন্তু যাত্রা যখন শুরু হয়েছে একবার তখন তার বিরতি বা পশ্চাৎগতি যে আর সম্ভব নয়, তাও তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষার আলোক চারিদিকে ভোরের আলোর মতো বিচ্ছুরিত হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করছে দেখে তাঁরা আশান্বিত হয়েছিলেন। জ্ঞানের কাছে অজ্ঞানতার, সুশিক্ষার কাছে অশিক্ষা-কুশিক্ষার, বিদ্যার কাছে অবিদ্যার, যুক্তিবুদ্ধির কাছে জাদুমন্ত্রের, আলোর কাছে অন্ধকারের পরাজয় যে আগামীকালে অনিবার্য, এ-সত্যও তাঁদের কাছে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছিল।

ডিরোজিওর মৃত্যুতে একটি তারা খসে গেল বাংলার আকাশ থেকে। উজ্জ্বল তারা। কিন্তু অগণিত তারার আলো তাতে কি ম্লান হবে কোনদিন? তারুণ্যের মনের আকাশে যে দীপ ডিরোজিও জ্বালিয়েছেন, তা আর নিষ্প্রভ হবে না। মুক্তচিন্তার নির্মল হাওয়ায় তার শিখা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হবে।

POETRY

SWEET madness !—when the youthful brain is seized
With that delicious phrenzy which it loves,
It raving reels, to very rapture pleased,—
And then through all creation wildly roves :
Now in the deep recesses of the sea,
And now to highest Himalay it mounts ;
Now by the fragrant shores of Araby,
Or classic Greece, or sweet Italia's founta,
Or through her wilderness of ruins ,—now
Gazing on beauty's lip, or valour's brow ;
Or rivalling the nightingale and dove
In pouring fourth its melody of love ;
Or giving to the gale, in strains of fire,
Immortal harpings—like a seraph's lyre.

February, 1827.

কবি ডিরোজিও

ধর্মতলা অ্যাকাডেমিব শিক্ষক ড্রামণ্ড তাঁর স্কুলেব ছাত্রদের জন্য একটি ছোট থিয়েটারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্রদের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা তৈরি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের মানসিক শক্তি ও অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি বলতেন যে অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি বালকচিত্তের স্বতঃস্ফূর্তিকে সজীব ও সক্রিয় করে তোলে। ড্রামণ্ডের স্কুলের এই থিয়েটার প্রসঙ্গে কোনো সমসাময়িক পত্রিকা মন্তব্য করেছিল "Mr Drummond .... constructed a little theatre in the Academy, which, with its proscenium, scenery, accommodation, and all 'appurtenances to boot' is highly creditable to his taste and judgment" ড্রামণ্ড যে বেশ যত্ন ও অর্থব্যয় করে ছাত্রদের জন্য থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এই সংবাদ থেকে বোঝা যায়।

২০ জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ধর্মতলা অ্যাকাডেমির এই রঙ্গমঞ্চে 'ডগলাস' (Douglas) নামে একটি ট্র্যাজেডির অভিনয় হয়। নাটকটি তৎকালের সাহেবমহলে খুব 'পপুলার' হয়েছিল। ড্রামণ্ডের ছাত্রদেব দ্বারা নাটকটি অভিনীত হবার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় (২২ জানুয়ারি ১৮২৪) একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বালক-অভিনেতাদের অভিনয়-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে। প্রসঙ্গত গেজেটে একজন বালক-অভিনেতার স্বরচিত প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়; "a highly appropriate and neatly written Prologue" দর্শকদের অবাক করে দিয়েছে। ড্রামণ্ডের স্কুলের ছাত্র ডিরোজিও এই প্রস্তাবটি কবিতাকারে রচনা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স

চোদ্দ বছর। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, দর্শকদের সম্বোধন করে বালক ডিরোজিও স্বরচিত প্রস্তাবনাটি পাঠ করেন—

As new fledg'd birds, while yet
Unus'd to soar,
Tremble the airy regions to
explore,
Mistrust their pow'r, yet doubting,
dare to fly,
And brave the dazzling brilliance
of the sky—
So, the poor train who now are
to appear,
Shrink e're they try—perplex'd
'tween hope and fear—
And tho' your smiles bespeak
indulgence certain,
Still, still they dread the rising
of the curtain.
No mighty Kemble here stalks
O'er the stage—
No Siddons all your feelings to
engage,
But a small band of young
aspirant boys
In faintest miniature the hour
employs.
Shall then as first, we spread
our ardent sails,
Like the thin Nautilus to catch

the gales !

By stormy frowns our feeble
bark to tost,

And having fondly dar'd, be
poorly lost ?

No—we will trust tho' rude be
our display,

You'll not forget, it is the first
essay

Of schoolboy effort, in the rolls
of time,

Yet ever witnessed in this
Orient clime—

We ask but this—and surely
'twill be granted—

Praise, if 'tis due—indulgence
when 'tis wanted.

চোদ্দবছরের যে কিশোর বালক এই স্বচ্ছন্দগতি ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করতে পারেন, মধুর কৌতুকরস মিশ্রিত করে, তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি নিন্দুকের পক্ষেও অস্বীকার করা কঠিন।*

জুলাই ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে *Oriental Herald* পত্রিকায় ডিরোজিওর কবিতাবলীর একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ২৩ নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের *Calcutta Gazette* পত্রিকায় সমালোচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। সমালোচনায় ব্যবহৃত কবিতাগুলি উল্লেখ না করে সমালোচনার মূল বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

* শ্রীঅমল মিত্র ডিরোজিওর এই কবিতাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উনিশ শতকে কলকাতা শহরে বালকদের থিয়েটার প্রসঙ্গে ১০ এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে "Little Actors of 19th Century Bengal"—কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে।

Derozio's poems

These volumes possess claims to our attention of a very unusual description. They contain the first productions of a young poet, a Native of British India, educated entirely in that country, and whose character, feelings, and associations, have been exclusively developed their, under circumstances apparently the most unfavourable to poetic excellence. These circumstances are thus intimated, in a letter which accompanied a copy of the poems, recently forwarded by an intelligent friend at Calcutta, to Mr. Buckingham :

"The writer was born in India, has never been out of it ; and is now under twenty years of age. You know this country, will be able duly to appreciate the difficulties against which he has had to contend. The total absence of almost all objects of natural beauty ; the still more complete want of all noble and exalted feelings amongst those with whom the poet must have associated ; the very language, which can hardly be called English, that they speak ; taking all these things into fair consideration, which you are well able to do from actual experience, we cannot but admit that production of such a poem as the 'Fakeer of Jungheera' is very extraordinary". "It is", he adds, "as if a Briton of the time of Severus, had suddenly written a poem in good Latin."

In this opinion, after a careful perusal of Mr. Derozio's two volumes, we very cordially concur. These volumes contain much that, under any circumstances,

would have been interesting; and which, under those abovementioned, is really extraordinary. Taken as a whole, it is true, his poetry is marked by great faults and blemishes, but he is nevertheless, a poet; and with better models in his eye than those on which he has obviously formed himself, he may, we conceive, one day produce something which neither India nor England 'would willingly let die'. He has much to learn, and more perhaps to unlearn, before he can hope to produce a poem of thorough excellence; but he is still very young, and he has real poetic power; much, therefore, may be hoped from him, if he will be rigid critic to himself. But without further introduction, we will now exhibit what this Indian poet can do, and then we shall talk of what he may do ...

The 'Fakeer of Jungheera', which gives a little to Mr. Derozio's last and principal volume, and which seems to be the composition on which he chiefly rests his young reputation, is, we must candidly confess, inspite of many reducing passage, a production not at all to our liking. It is altogether upon the strained and extravagant model of Lord Byron's poetic romances of love and murder; and too like the exaggerated imitation of the worst Byronie style, with which we have been overflowed in this country, even to nausea, ...Mr. Derozio has had the misfortune, like some other aspirants of no mean promise, to be carried away by the pegasian hyppography of this Byronic school, high into the perilous regions of exaggerated passion, and false to sentiment; and we wish

we could assist in leading him back to the pleasant paths of simplicity, in the salubrious land of genuine nature, where we are convinced he might yet attain poetic distinction of no mean order,

....Byron's points of excellence were peculiar, and not capable of being attained by imitation ; but all that was overcharged in his delineation of character, outrageous or untrue in passion and sentiment, tinselly in description, or turgid, abrupt, and harsh in versification,—could be imitated, and has accordingly found numerous imitators.

In this class we are reluctantly constrained to rank Mr. Derozio ; or perhaps, it would be more correct to say, that his style and manner, though borrowed in a great degree from Byron, are characterized also, by frequent resemblances to the other fashionable poetry of the day, to which his reading seems to have been unfortunately almost exclusively confined. Thus, we are continually reminded of Moore's 'Lallah Rookh', and Miss Saunder's 'Troubadour', and other things of the same seven-times-diluted sort, which have lain in ladies' boudoirs, and been sighed over by drawing-room sentimentalists, during the last seven years, and which have no doubt, had their admirers in India, as well as in England. It is in all likelihood more Mr. Derozio's misfortune than his fault, that such flimsy volumes have, in addition to Byron's works, formed almost exclusively his poetic pabulum ; but it is great misfortune, notwithstanding ; and it has infected his whole style of compositions to such an extent,

as almost to destroy with gaudy verbiage the really beautiful and fragrant flowers of poetic fancy, which are genuine offspring of his ardent and elegant mind........

Scattered throughout this 'Metrical Tale', as well as in other parts of Mr. Derozio's two volumes, are many brilliant little gems of poetry—somewhat too much in the fanciful style of Moore perhaps,—but still very pleassing and felicitous.

ডিরোজিওর কবিতার এরকম বিস্তৃত সমালোচনা সমসাময়িক আর কোনো পত্রিকায় বা লেখকের রচনায় করা হয়েছে বলে আমরা জানি না। উদ্ধৃত সমালোচনাটি তাই দীর্ঘ ও বেশ কিছুটা দুর্মর হলেও, কৌতূহলী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা সঙ্গত বলে মনে করেছি। একথা ঠিক যে ডিরোজিওর অধিকাংশ কবিতায় বায়রন, স্কট, মূর ও অন্যান্য উনিশ শতকের ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের প্রভাব খুব বেশি। ডিরোজিওর তরুণ বয়সের কথা মনে রাখলে তাঁর উপর ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের এই প্রভাব অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও একথা অতিবড় নিন্দুকও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে তাঁর স্বকীয় কবিত্বশক্তি যথেষ্ট ছিল, এবং পরিণত বয়সে অভিজ্ঞতা ও মানসিক সমন্বয়শক্তি বাড়লে, অধীত বিদ্যা, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটলে, তিনি নিঃসন্দেহে সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি হতে পারবেন।

ডিরোজিওর *The East Indian* পত্রিকার এই Prospectus ১৬ মে ১৮৩১ 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

PROSPECTUS OF THE EAST INDIAN, a Daily News-paper, to be published at Calcutta from the 1st of June 1831, Subscription: Five Rupees per month. This paper which will be composed of as good materials and possess as extensive resources as the morning Journals of this presidency is offered to the notice of the public at the cheap rate of Five Rupees per month. It will be published daily on a large royal sheet of fine paper and will be despatched with punctuality to all parts of the country. Arrangements having been made to secure for it the earliest intelligence form Europe, South Africa, the Eastern Island, Madras, Bombay, and the upper Provinces the patronage of this Community is respectfully solicited for an undertaking which depends upon encouragement for success. To prevent any misconception to which the name of the paper may give rise the Proprietor begs to state that his Journal will not be exclusively devoted to any particular interest, but that it will advocate the just rights of all classes of the community.

References and applications could be made to Mr. H. L. V. DEROZIO, Circular Road, Calcutta.

লক্ষণীয় হল, পত্রিকার নাম 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' বলে যাতে পাঠকরা ফিরিঙ্গি-সমাজের মুখপত্র বলে তাকে মনে না করেন, তার জন্য প্রসপেকটাসে বলা হয়েছে যে এই পত্রিকা "will advocate the just rights of all classes of the community."

Extracts from the Proceedings of the Hindu College Committee relating to the dismissal of Henry Louis Vivian Derozio,

February 5, 1831

No. 17. Read a letter from Mr. De Rozio preferring a charge against Mr. D'anselme and Requesting the Committee to investigate the matter.

Mr. D'anselme and Mr. Derozio being called upon and required to state the circumstances before the Committee upon which they respectively authorized the Committee in the following manner.

No. 18. "Mr. D'anselme assured the Committee that he deeply regrets having suffered his feelings to get the better of his judgement and under an impression of an insult from Mr. De Rozio which he is satisfied was not intended to use objectionable language and gestures towards that gentleman ; he also express his regrets for having addressed unbecoming language to Mr. Hare and pledges himself to the Committee that a Repetition of the offence shall not occur.

Signed I. I. (?) D'anselme

No. 19. "Mr. Derozio declares that in denying the assertion made by Mr. D'anselme of his frequently obtaining permission at an earlier hour to leave the College for

the purpose of preparing for his lectures he is not conscious of having used language or gestures calculated to offened Mr. D' anselme that it was far from his intention to have failed in his respect towards Mr. D' anselme and that he regrets that Mr. D' anselme should have supposed he had any intention to treat him with insult or disrespect.

Signed H. L. V. Derozio

Ordered that Mr. D' anselme and Mr. Derozio resume their respective duties.

Ordered that no holiday or half-holiday (the fixed holidays excepted) shall be granted to the College on any account whatever without a written order from one of the Managers.

Saturday, April 23, 1831

At a Special Meeting of the Directors of the Hindoo College held at the College house on Saturday the 23rd April 1831.

Present

Baboo Chundro Coomar Tagore—Governor H. H. Wilson Esqr.—Vice Presdt.

Baboo Radhamadub Benerjea

„ Radha Canto Deb

„ Ram Comul Sen

Da Hare Esqr.

Baboo Russomoy Dutt

„ Prasonno Coomar Tagore

Baboo Sri Kishen Sinh

Luckynarayan Mookerjea—Secretary

Read the following Memorandum on the occasion of calling the Present Meeting.

"The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the Public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain Teacher in whom great many children have been interested who it appears have materially injured their Morals and introduced some strange system the tendency of which is destruction to their moral character and to the peace in Society.

The affair is well-known to almost everyone and need not require to be stated.

In consequence of his misunderstanding no less than 25 Pupils of respectable families have been withdrawn from the College a list of which is submitted. There are no less than 160 boys absent some of whom are supposed to be sick but many have purposed to remove unless proper remedies are adopted a list of them is also submitted. There have been much said and heard in the business but from the substance of the letters received and the opinion of the several directors obtained the following rules and arrangements are submitted for the consideration and order of the Meeting.

Read also various letters withdrawing boys from the College.

Read the following Memorandum.

Memoranda of the proposed rules and arrangements.

1. Mr. Derozio being the root of all evils and cause of Public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the Pupils be cut off.

2. Such of the students of the higher class whose bad habits and practices are known and who were at the dining party should be removed.

3. All those Students who are publicly hostile to Hindooism and the established custom of the Country and who have proved themselves as such by their conduct, should be turned out.

4. The age of admission and the time of the College Study to be fixed 10 to 12 and 18 to 20.

5. Corporal punishment to be introduced when admonition fails for all crimes committed by the boys. This should be left at the discretion of the head Teacher.

6. Boys should not be admitted indiscriminately without previous enquiry regarding their character.

7. Whenever Europeans are procurable a preference shall be given to them in future their character and religion being ascertained before admission.

9. (sic) Boys are not to be allowed to remain in the College after school hours.

10. If any of the boys go to see or attend private lectures or meetings, to be admissed.

11. Books to be read and time for each study to be fixed.

12. Such books as may injure the morals should not be

allowed to be brought, taught or read in the College.

13. More time for studying Persian and Bengally should be allowed to the boys.

14. The Sanskrit should be studied by the Senior Classes.

15. Monthly Stipends be granted only to those who have good character, respectable Proficiency and whose further stay in the College be considered beneficial.

16. The student wishing to get allowance must have respectable proficiency in Sanskrit and Arabic.

17. The boys transferred from the School Society's Establishment to be admitted in the usual way and not as hitherto and their posting class to be left to the head Teacher.

18. The practice of teaching boys in a doorshut room should be discontinued.

19. A separate place be fitted for the teachers for their dining and the practice of eating upon the schools Table be discontinued.

With reference to the 1 article of the above the following propositions was submitted to the meeting and put to the vote.

"Whether the managers had any just ground to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produces upon his Scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Chandra Coomar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instruction except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.

Baboo Radha Canto Deb stated that he considered Mr. Derozio a very improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Russomoy Dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prosonno Coomar Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radhamadub Banerjee believed him to be an improper person from the report he heard.

Baboo Ram Comul Sen concurred with Baboo Radha Canto Deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Sri Kishen Sinh was firmly convinced that he was far from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been most beneficial.

The majority of the managers being unable from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher the committee proceeded to the consideration of the negative question.

Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of

Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

Baboos Chandra Coomar Togore, Radha Canto Deb, Ram Camul Sen, and Radhamadub Banerjea Banerjea (sic) voted that it was necessary.

Baboos Russomoy Dutt and Prasonna Coomar Tagore that it was expedient and Baboo Sri Kishen Sinh that it was unnecessary.

Mr. Wilson and Mr. Hare declined voting on a subject affecting the state of native feeling alone.

Resolved that the measure of Mr. Derozio's dismissal be carried into effect with due consideration for his merits and services

Proceeded to consider the rest of the proposed rules.

Resolved that rule 2 was unnecessary the Committee having already the power of dismissing any boy from the College by Rule of the printed Regulations.

Resolved with regard to rule 3 that the Regulation of the conduct of the boys in this respect is best left to the Parents themselves who if they have reason to think that the College is the cause of hostility to Hindoism in their children can at any time withdraw them from it.

Resolved that article 4 is unnecessary.

Resolved that Rules 5 & 6 be adopted.

Resolved that Rules 7 be adopted in the following form.

"In future a preference shall be given to qualified European Teachers whenever procurable and after due investigation of their moral and religions character."

Resolved that Rule 9 be adopted with the addition—without some satisfactory reason.

Resolved that the Managers have not the power nor the right to inforce the prohibition prescribed by Rule 10 and the conduct of the boys in those respects must be left to the regulation of their friends and relations.

Resolved that Rules 11 and 12 be adopted also Rule 13 with the addition "whose friends are desirous they should learn those languages."

Resolved that Sanskrit and Persian are actually studied by the first class but that little progress has been made or can be expected under the present system of teachiug and that the best method ot improving these branches of study remain for further consideration.

Resolved that the provisions of Rules 15 are already in force and that it is not in the Competency of the Committee to adopt the 16 Rule, the scholarships being established by the Committe of Public Instruction for proficiency in English.

Resolved that Rule 18 be left for further consideration and that Rule 19 be adopted.

Read the following correspondence with the Sambad Prabhakar.

To

The Proprietors of the Sambad Prabhakar

Sir,

Having observed a letter in your paper of the 15 (?) April No. 12 reflecting in very unbecoming language

upon the character of the teachers of the Hindoo College —I have to request your informing me of the writers name that legal measures may be adopted for his punishment.

I am etc.

Hindoo College
the 19 April 1831

Luckynaron Mookerji
Secy. H. College.

To

The Secretary to the Hindoo College

Sir,

In acknowledging the receipt of your letter dated 19 instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12th No. of the publication, I am authorised in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letter to bring the Colleges institution or the characters of its teachers and Members as a body into hatred and contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a Public journal to meet your calls as Secretary of the College, when the writer positively denys any intension to have offered any unbecoming language either towards the institution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

I am etc.

(Signed) Isher Chunder Gopto
Editor Proprietor of Probhakar

23rd April 1831

Resolved that the following letter be written to the Editor.

To

The Editor of the Sumbad Probhakor

Sir,

I am desired by the Manging Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23d Inst it has not been considered as altogether satisfactory. They expect therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputation against the teachers of the Hindoo College.

I am etc.

May, 7, 1831

— — — The following letters were submitted relative to the boys who have left College since the Special Meeting.

(13 letters of withdrawal)

— — — No. 30. Letter from Mr. Derozio communicating his resignation and commenting on the Resolution of the committee passed at the Special Meeting to dismiss him without examining the circumstances thereof and affording him time to vindicate his character from those accusations which have been fixed upon it.

25 April.

No. 31. Letter from Ditto furnishing replies to the Queries put on him by the Vice-President as to have inculcated the following lessons. Firstly Denying the existence of God. Secondly to Parents & thirdly marriage with sisters.

26 April.

Resolved that these letters be circulated to the Committee of Management.